বিবাহসংস্কার।

(সামাজিক প্রবন্ধ)

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত।

"The soul stipulates for no private good. That which is private I see not to be good. "If truth live, I live; if justice live, I live" said one of the old saints, "and these by any man's suffering are enlarged and enthroned."—*Emerson*

"If an offence come out of the Truth, better is it that the offence come, than the Truth be concealed."—*Jerome.*

"Not dead but living ye are to account all those who are slain in the way of God." *Mahomet.*

কলিকাতা,

২৪নং বীডন্ ষ্ট্রীট ভিক্টোরিয়া প্রেসে শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত
ও ২১০।৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট আনন্দাশ্রম হইতে গ্রন্থকার
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ফাল্গুন ১২৯৬।

বিবাহ-সংস্কার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যৌবন-বিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ।

আমরা পূর্ব্বে স্বামী ও স্ত্রী নামক (১) প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি যে, বিবাহ প্রথা অসংস্কৃত থাকাতেই বহুবিবাহ প্রথা সমাজে চলিতেছে। বহুবিবাহ প্রথা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়, ইহা প্রতিপন্ন করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছি। বিধবা বিবাহ ও বিপত্নীক বিবাহও যে বহুবিবাহের অঙ্গ, ইহাও আমরা বলিয়াছি। এই সকল কুপ্রথা তুলিয়া দিতে হইলে, আদর্শ বিবাহ প্রথা যাহাতে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য ঐকান্তিক চেষ্টার প্রয়োজন। বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকিতে সমাজে আদর্শ বিবাহ প্রতিষ্ঠিত হইবে, কথনই আশা করা যায় না। তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে বাল্যবিবাহ তুলিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু এ পথে যে সকল অন্তরায় আছে, তাহার বিষয় একবার বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। আমরা এই পুস্তকে সংক্ষেপে এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বাল্যবিবাহ যে সর্ব্বপ্রকার অনর্থের মূল, এ কথা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই, যৎসামান্য কিঞ্চিৎ আলোচনা আমরা যথাস্থানে করিব। ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদীসম্মত (২)। সর্ব্ববাদীসম্মত কুপ্রথা কেন সমাজে অবাধে চলিতেছে,—পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবল পরাক্রম কেন এই স্রোত সম্যকরূপে ফিরাইতে পারিতেছে না,—ইহার একমাত্র কারণ এই,—এই প্রথা তুলিয়া দিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, এ বিষয়ে এথনও গভীর মতভেদ রহিয়াছে।

---

(১) জ্যোতিকণা—১১৩ পৃষ্ঠা দেথ।

(2) See Selections from the Records of the Government of India in the Home Department, Papers relating to infant marriage and enforced widow-hood in India.

সমাজের সকল লোকের প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ না হইলে বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিলে অনিষ্ট হইবে, কেহ কেহ বলেন। অন্যদিকে, কিছুদিন হইতে বঙ্গের কৃতবিদ্য দেশহিতৈষী মালাবারি মহোদয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা একখানি আইন প্রণয়ন করাইবার জন্য বাল্যবিবাহ ও তাহার কুফল সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। এ দেশের লোকেরা আইনের দ্বারা সমাজ-সংস্করণের বড় পক্ষপাতী নয়। এইজন্য অনেক ব্যক্তি মালাবারির এই মহদনুষ্ঠানের পথে কণ্টক রোপণ করিতেছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হন নাই। কিছুদিন হইল, গবর্ণমেণ্ট বিস্তৃত একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে বাল্যবিবাহ ও বালবৈধব্য প্রথা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের বিজ্ঞ বিজ্ঞ লোকদিগের মত সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহা পাঠে জানা যায় যে, প্রায় সকলেই একবাক্যে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু অনেকে আইনের তত পক্ষপাতী নহেন। সে যাহাই হউক, মহাত্মা মালাবারির দ্বারা এ বিষয়ে যে ভারতে একটী তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে, এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই; এবং এইরূপ আন্দোলনে যে কোনরূপ সুফল ফলিবেই ফলিবে, তাহা একরূপ নিশ্চয়।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত যত লোক বাল্যবিবাহের দোষ-কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই শারীরিক অপকারের বিষয় অধিক উল্লেখ করিয়াছেন। শরীরই যেন তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। শরীরের সহিত ধর্ম্ম ও নীতির যোগ না থাকিলে যে বিশেষ কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই, একথাটী অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছেন। অধিক বয়সে বিবাহ হইলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, পছন্দ-সই মিলন হইবে, এই আনন্দেই অনেকে উৎফুল্ল। অধিক বয়সে বিবাহ হইলে ধর্ম্ম ও নীতি-শিথিলতার সম্ভাবনা আছে কি না, এ সম্বন্ধে অনেকেই আলোচনা করেন না। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ধর্ম্ম ও নীতিকে লক্ষ্য হইতে দূরে রাখিয়া যে সমাজ-সংস্করণ, তাহার দ্বারা কখনই মানবের চির-কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। পাশ্চাত্য সমাজ সমূহে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই, কিন্তু সেখানেও, যে স্থলে জীবন্ত ধর্ম্ম ও নীতির ভিত্তির উপর যৌবন-বিবাহ প্রতিষ্ঠিত নয়, সে স্থলে যে কি ভয়ানক অনিষ্ট হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই গুরুতর বিষয় আলোচনার সময় ধর্ম্ম ও নীতিকে লক্ষ্য-পথে রাখা একান্ত উচিত। কিন্তু সমাজ এ সম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন।

একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গপ্রদেশে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে কিছু বিশেষ আন্দোলন উঠিয়াছিল। সেই সময়ে অনেক বিজ্ঞ ডাক্তারের মত গ্রহণ করা হইয়াছিল। ডাক্তারেরা সকলেই প্রায় একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, কন্যার চতুর্দ্দশ বৎসরের পর ও বালকের অষ্টাদশ বৎসরের পর সন্তান জন্মিলে, বলিষ্ঠ ও সতেজ হইবার সম্ভাবনা আছে (১)। তদনুসারে যে একখানি আইন প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে কন্যার বিবাহের ন্যূন বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর ও বালকের বিবাহের ন্যূন বয়স অষ্টাদশ বৎসর ধার্য্য হইয়াছে (২)। ঐ সময়ে এ প্রশ্নের বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই যে, ১৪ ও ১৮ বৎসর বয়সে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। যে সমাজে এই আইন অনুসারে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, সেটী একটী ধর্ম্মসমাজ। ধর্ম্ম সমাজের কার্য্য সংসারের দিক ও বিজ্ঞানের দিক বজায় রাখিয়া যত নির্ব্বাহিত হইতেছে, আধ্যাত্মিক দিকের তত খোঁজ খবর নাই! কেবল বয়সের ভিত্তির উপর প্রধানতঃ এই গুরুতর বিষয়টীকে নির্ভর করাতে স্থানে স্থানে বড়ই অমঙ্গল ঘটিতেছে। এমন কি, কোন কোন স্থলে বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক হইতে থাকে, বরকন্যার পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয়ত ১১।১২ বৎসর বয়সের সময় হইতেই আরম্ভ হয়, তারপর কোন প্রকারে বর কন্যার ১৪।১৮ বৎসর পূর্ণ হইলেই হয়!! এরূপ স্থলে অভিভাবকেরা একবারও ভাবেন না যে, ১৪।১৮ বৎসর পূর্ণ হইলেই নীতি বা ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে না। আর একটী কথা। অপরিপক্কবুদ্ধি বালিকার চৌদ্দ বৎসরের পূর্ব্বে যখন বিবাহের প্রস্তাব উঠে, তখন সেটা কি বাল্যবিবাহের রূপান্তরিত অবস্থা নয়? হৃদয়কে ব্যাকুলিত করিতে দিয়া ও অপরিপক্ক মনে এই সকল চিন্তা জাগাইয়া দিয়া তারপর বয়স পূর্ণ করাইবার জন্য ২।৪ বৎসর অপেক্ষা করিলেই বাল্যবিবাহ রহিত হয় না। আমাদের মতে বাগ্দান (Betrothal) প্রথাও দূষণীয়। সম্বন্ধের পর অনেকদিন অপেক্ষা করাতে যে কত অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে, তাহা একমুখে বলা যায় না! বিশেষতঃ ধর্ম্ম ও চরিত্র-হীন মানুষ এরূপ বাগ্দানের অবস্থায় না করিতে পারে, এমন কাজ নাই।

আমাদের বিবেচনায়, বিবাহবন্ধন একটী সংসারের বন্ধন নয়, ইহা একটী ধর্ম্মবন্ধন। কেবল বিজ্ঞান-সম্মত হইলেই ইহাতে মঙ্গল হয় না, কিন্তু

---

(১) নব্যভারত—৫র্থ খণ্ড ৩য় সংখ্যা দেখ।

(২) Act III of 1872.

ধর্ম্ম ও নীতিসম্মত হওয়া একান্ত উচিত। অধিক বয়স পর্য্যন্ত বরকন্যাকে অবিবাহিত রাখিতে হইলে, সমাজকে বিশুদ্ধ পবিত্র ধর্ম্ম-বায়ুতে রঞ্জিত করা উচিত। বরকন্যাকে বুঝিতে দেওয়া উচিত যে, ধর্ম্ম ভিন্ন জীবন নাই, ধর্ম্ম ভিন্ন সুখ নাই,—ধর্ম্ম-জীবন লাভই বিবাহের উদ্দেশ্য, ও তাহার সহায়তার জন্যই এই মধুর বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা। অবিশ্বাসপ্রধান সমাজে বিজ্ঞান-সম্মত যৌবনবিবাহে ভয়ানক দুর্গতি ঘটে! ধর্ম্ম ভুলিয়া বিজ্ঞান-সম্মত বিবাহ কোন-ক্রমেই মঙ্গল-প্রসূ নয়। মানুষ ধর্ম্মপ্রধান জীব। ধর্ম্ম ও চরিত্রই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য এবং তাহাতেই মানুষের বিশেষত্ব। উপযুক্ত বয়সে বিবাহ হইলে সন্তান বলিষ্ঠ হইবে, দীর্ঘজীবী হইবে, মানুষের পক্ষে এ অসার গণনা-পেক্ষা, অধিক বয়সে ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বিবাহিত হইলে ধর্ম্মের বন্ধন আরো দৃঢ় ও অটল হইবে, পিতা মাতার আদর্শে সন্তান নীতি ও চরিত্রবান হইবে, মানুষের পক্ষে এ গণনা সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয়, এ চিন্তা অতি অল্প লোকের মধ্যে দেখা যায়। সুতরাং যে কুফল ফলিবার, তাহা এদেশে অবাধে ফলিতেছে। দেশ দিন দিন নীতি ও ধর্ম্মহীন, সুতরাং চরিত্রহীন হইয়া উঠিতেছে। বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিয়া যে যে সমাজে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত হইতেছে, সে সকল সমাজেও যে আদর্শ বিবাহ হইতেছে না, এ কথা বলিবার সময় আমাদের একটুও সঙ্কোচ হয় না। বাল্যবিবাহে ভারতে যে কুফল ফলিতেছে, ধর্ম্মশূন্য যৌবন-বিবাহে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যে সহস্রাংশে তদপেক্ষা অধিক কুফল ফলিতেছে, এ কথা কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না। বাল্যবিবাহের বিরোধী দলের এ কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করা উচিত।

আমরা জানি যে, বালবৈধব্য বাল্যবিবাহের একটী কুফল (১)। বাল-বৈধব্য যে দেশের কি ভয়ানক অমঙ্গল করিতেছে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু সে কেবল এজন্য নয় যে, দেশে জারজ সন্তান জন্মিতেছে বলিয়া;

---

(১) Again, nearly one fifth * of all the women in India are widows, although only one twentieth † of the men are widowers, the difference in the numbers of the widowed being mainly due to the large proportion of the girls who contract marriage in childhood, combined with the fact that men remarry as a rule and women do not."

H. GOODRICH.

* 19 per cent.

† 5 per cent.

জারজ সন্তানের আশঙ্কা যৌবন-বিবাহেও আছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত থাকা স্বত্বেও চরিত্রহীন লোক ও জারজ সন্তানের সংখ্যা ভারতবর্ষ অপেক্ষা কম নয় (১)। আমরা বালবৈধব্য পছন্দ করি না এই জন্য যে, বাল্যকালে চরিত্রই গঠিত হয় না। এই অগঠিত চরিত্রে এই গুরুতর ব্রত পালন করা লোকের পক্ষে অসম্ভব। মহা মহা ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ যৌবন-তাড়নায় যে স্থলে চঞ্চল-পদ, অল্পবুদ্ধি ও অস্থিরমতি বালিকারা সেই স্থলে অটল থাকিবে, যে আশা করে, সে ঘোরতর মূর্খ। কেবল আইনের শাসন ও লোকলজ্জায় ধর্ম্ম রক্ষা করা যায় না। এই জন্য দারুণ চরিত্রহীনতা বালবিধবাদিগকে আক্রমণ করে। তারই শোচনীয় ফল ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি। সুতরাং ভ্রূণহত্যার পূর্ব্বে যে চরিত্রহীনতা, তাহাই সর্ব্বাগ্রে অনিষ্টকর। ধর্ম্মকে ভিত্তি না করিয়া যত দিন বিবাহ চলিবে, ততদিন বালবিধবা বা যুবতীবিধবা নিশ্চয় চরিত্রহীন হইবে। তবে শতকরা দশবিশটী ভালও থাকিবে,—থাকিতে পারে। কিন্তু সে তাহারা, যাহাদের ধর্ম্মে অটল মতি আছে। চরিত্রহীন মানুষ পশু অপেক্ষাও যে ঘৃণিত, সে কথা আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

অগঠিত চরিত্রে মানুষ ভাল মন্দ বুঝিতে পারে না। অগঠিত চরিত্রের মূলে ধর্ম্মের ভিত্তি নাই। ধর্ম্ম ভিত্তি নাই যাহার, সে মানুষই নয়। তাহারা ভাল মন্দ বুঝিতে পারে না, সুতরাং অন্যের অনুরোধ উপরোধে তাহারা পরিণীত হয়। সে বিবাহ তাহাদের নিজেদের বিবাহ বলিয়া গণনা করা উচিত নয়। বাল্যকালে বিবাহের সময় তাহারা যে মন্ত্র উচ্চারণ করে, সে মন্ত্রের অর্থ পর্য্যন্ত তাহারা জানে না। অর্থ জানে না, অথচ অন্যের কথায় মন্ত্র উচ্চারণ করে। তাহারা এইরূপে বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মকে অবহেলার চক্ষে দেখিতে শিক্ষিত হয়। বিবাহের মূল যে ধর্ম্মবন্ধন, এটা তাদের ধারণা থাকে না। সুতরাং বিধবা হইলে কিয়দ্দিবসের মধ্যেই তাহারা পুনর্ব্বিবাহের জন্য প্রস্তুত হয়।

(১) "আইরিস চর্চ্চ এবালিস করা লইয়া যখন ডিসরেলী গ্লাডষ্টোনে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়াছিল, তখন অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছিল, বিলাতের কুমারীদিগের প্রসূত জারজ সন্তান প্রতিপালন করিবার জন্যই বিলাতে তখন ন্যূনকল্পে ৭০০০ আড্ডাঘর স্থাপিত ছিল। এই ৭ হাজার ঘরে অন্ততঃ একলক্ষ জারজ সন্তান প্রতিপালিত হইত। এই লক্ষ সন্তানের লক্ষ প্রসূতি অপেক্ষাও কি এই দেশের বিধবাদিগের অবস্থা শোচনীয়?" শক্তি—১০ই পৌষ, ১২৯৫।

See also Malthus on Population, p. 20 and 21.

ধর্ম্মে যে পতি পত্নীর মিলন হইল না, ইষ্টদেবতাকে প্রত্যক্ষ জানিয়া যাহারা প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইল না—অন্যের অনুরোধ উপরোধে কেবল যাহারা মন্ত্র উচ্চারণ করিল, তাহারা কেন ধর্ম্মকে মান্য করিবে? কেন বিবাহ-বন্ধনকে জীবন-সম্বল করিবে? কেন সমাজ-শাসনকে ভয় করিয়া আজীবন কষ্ট পাইবে? এই কারণেই, বাল-বিধবা ও বাল-বিপত্নীকেরা আবার বিবাহিত হইতে চায়। কিন্তু হিন্দুসমাজে বালবিধবার বিবাহ প্রচলিত নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ শাস্ত্র-সিদ্ধ বলিয়া প্রমাণ দিলেও (১) বিধবা বিবাহ হিন্দুসমাজে চলে নাই। সুতরাং তাহাদের যে চরিত্রহীনতা ঘটিবে আশ্চর্য্য কি? ভারতবর্ষে হিন্দু ১০ দশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালিকা-বিধবার সংখ্যা ৫৪,৫৭৯ এবং পঞ্চদশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালিকা-বিধবার সংখ্যা ১৪৬,১০৯ (২)। এতগুলি অল্পবয়স্ক বিধবা যে দেশে, সে দেশের বায়ু চরিত্র-হীনতায় অপবিত্র হইবে না কেন? এই অপবিত্রতা দূর করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিয়াছেন। কিন্তু বিস্তৃত ভারত ভূমিকে সংস্কার করিতে ব্রাহ্মসমাজের সাধ্য কি? সুতরাং দেশের শোচনীয় অবস্থা সমভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজও যে বালিকার চতুর্দ্দশ বৎসর ও বালকের অষ্টাদশ বৎসর বিবাহের বয়স ধরিয়াছেন, আমাদের মতে তাহাও বাল্যকাল। এ সময়েও ধর্ম্মবুদ্ধি প্রখর হয় না, বিশ্বাস অটল হয় না;—এটাও জীবনের নিতান্ত চঞ্চলতা বা পরিবর্ত্তনের সময়। এটাও আদর্শ বিবাহের সময় নয়। এ সময়েও ধর্ম্মে প্রকৃত আস্থা জন্মে না। ইহার পূর্ব্বে যদি বিবাহের সম্বন্ধ হয়, তবে সেটা যে সর্ব্বপ্রকারেই বাল্যবিবাহ অপেক্ষাও দোষের, সে কথা না বলিলেও অনেকে বুঝিবেন। অস্থায়ী চঞ্চল ভালবাসার দারুণ চিন্তা, অসাময়িক প্রেম-পিপাসায় কত যুবক যুবতী যে পড়াশুনার নিকট চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা বিলক্ষণ জানেন। এই সময়ে রূপজ-মোহ বড়ই বিঘ্ন ঘটায়। এই সময় আশা-কুহকে মানুষকে বড়ই মাতায়। এই সময়ে নানাপ্রকার বিষম অমঙ্গল ঘটে। একথা বিবাহবাদী সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বিবাহের পূর্ব্বে এমন কোন আচার ব্যবহার অবলম্বিত হইতে

---

(১) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ নামক পুস্তক দেখ।

(২) See Census Report, 1881, or Records of the Government of India No. CCXXIII, p. 299.

দেওয়া উচিত নয়, যাহা বিবাহের পর অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু এই ঔচিত্যানুচিত্য ১৪।১৫ বৎসরের ধর্ম্মশূন্য বালিকা বা ১৮।১৯ বৎসরের চরিত্রহীন বিবাহ-প্রার্থী বালক কি বুঝিবে? সুতরাং তাহাদিগকে যখন বিবাহের পূর্ব্বে দেখা সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয়, তখন যে কুফল ফলিবে না, কে বলিতে পারে? আমরা দেখিয়াছি, এরূপ স্থলে নির্ব্বাচন-প্রণালী গরল উৎপন্ন করে। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি, সমাজ-শাসন বা লোকনিন্দা এ সকল স্থানে বিশেষরূপ কার্য্যকরী হয় না। লোকের মনে ধর্ম্মভয় না থাকিলে কিছুতেই অহিতাচরণ হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে পারা যায় না। লোক যখন দুর্দ্দমনীয় রিপুর উত্তেজনায় মাতিয়াছে, তখন তোমার আইন ও গ্লানি-রটনার কথা বা ভালবাসার অনুরোধ সে শুনিবে কেন? হায়, এই-রূপ উত্তেজনায় কত লোক যে বিবাহের পূর্ব্বে কলঙ্কিত হইয়া সমাজকে অপবিত্র করিয়া ফেলিতেছে, কে তাহা গণনা করিতে পারে? পাশ্চাত্য সমাজ-সমূহে বিবাহের পূর্ব্বে কত ভ্রূণহত্যা হয়, কত জারজ সন্তান জন্মে, কে না জানেন? ইংলণ্ডে বিবাহের সংখ্যা কম (১), কিন্তু সেখানে চরিত্রহীনতার পরাকাষ্ঠা। শনিবারের রাত্রে বিলাতের কোন রাস্তার চিত্র দেখিলে চক্ষু-স্থির হয়। সে সকল দেশে জারজ সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করার পর্য্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে! আমাদিগের দেশে যৌবন-বিবাহ বহুল-রূপে এখনও প্রচলিত হয় নাই বলিয়া এখনও কুমারীদিগের মধ্যে তত কুফল ফলিতে দেখা যাইতেছে না। কিন্তুও অল্পকালের মধ্যে যে সকল জঘন্য চিত্র দেখিতে হইতেছে, ইহাতে দারুণ নিরাশা আসিয়া প্রাণকে অস্থির করিয়া ফেলিতেছে, সুতরাং এই স্বেচ্ছাচারিতার দিনে, এখন হইতে বিশেষ সতর্ক না হইলে, ভবিষ্যতে দেশের যে কি ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা কল্পনায়ও অঙ্কিত করা যায় না।

এই সকল নানা কারণে, আমাদের বিবেচনায়, বিবাহের উপযুক্ততা কেবল বয়সানুসারে নির্দ্দেশ না করিয়া, চরিত্র ও ধর্ম্মজীবন-গঠনানুসারে নির্দ্দেশ করা উচিত। অভিভাবকের মতামতের উপর এ সম্বন্ধে অধিক পরিমাণে নির্ভর করা উচিত। বর কন্যা সচ্চরিত্র না হইলে, সমাজানুমোদিত বিবাহ

(১) "These show that the annual marriages in England and Wales, are to the whole population as 1 to 123¼, a smaller proportion of marriages than obtains in any of the countries examined, except Norway and Switzerland." *Malthus on Population.*

হইবে না, অভিভাবক সম্মতি দিবেন না, এরূপ নিয়ম প্রচলিত হইলে সমাজের কতক মঙ্গল হইবার কথা। পুত্র বা কন্যা যদি বুঝিতে পারে যে, জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত বিশ্বাসী হইতে না পারিলে, পিতা বা অভিভাবক বিবাহ দিবেন না, তবে আশা হয়, কতক ধর্ম্মের দিকে তাহাদের মতি ফিরিতে পারে। অর্থ ও বিদ্যা সম্বন্ধীয় উপযুক্ততা অনেকেই আজ কাল দেখিয়া থাকেন, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, ধর্ম্ম ও চরিত্র সম্বন্ধীয় উপযুক্ততার প্রতি অল্প লোকেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন। সে দিন আমাদের দেশের কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন যে, আমাদের স্কুল প্রভৃতিতে ধর্ম্ম ও নীতির চর্চ্চা না থাকায়, ধর্ম্ম ও নীতি যে মানুষের লক্ষ্য, এ অত্যাবশ্যকীয় কথাটাও বালকেরা ভুলিয়া যাইতেছে। আমাদের বিবেচনায়, কেবল স্কুলের প্রতি একথাটা সাজে না। আমাদের প্রতি কাজে, প্রতি কথায় প্রতিপন্ন করে যে, ধর্ম্মটা জীবনের লক্ষ্য নয়। বিবাহের সময় বর কন্যার কুলমান, রূপ, অবস্থা এবং স্থানে স্থানে বিদ্যার সংবাদও লওয়া হয়। কিন্তু চরিত্র ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ লওয়া হয় না। এই সকল ঘটনায় দেশের সামান্য অনিষ্ট হইতেছে না। অতএব এই গুরুতর অনুষ্ঠানের সময় ধর্ম্ম ও চরিত্রতত্ত্ব লওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। বাল্যবিবাহ বিবাহই নয়, কারণ ধর্ম্মজ্ঞান তখন মোটেই জন্মিতে পারে না। সে কালের ধ্রুব প্রহ্লাদের ন্যায়, বাল্যকালে, এখন অতি অল্প লোকের ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস জন্মে। যদি সেরূপ ধর্ম্ম-জীবন কাহারও থাকে, তবে অভিভাবকেরা তাহার ইচ্ছানুরূপ বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন, দিবেন। কিন্তু সে বিচার-ভার বরকন্যার উপর না রাখিয়া অভিভাবকের উপর রাখিতে হইবে। যুবক যুবতীর প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মে দীক্ষা না হইলে, যৌবন-বিবাহকেও কোন সমাজের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। তাহাদের জন্য কি তবে কোন পথ নাই?—আছে বই কি; ঐ নরকের পথ—ঐ ব্যভিচারের পথ তাহাদের জন্য অবারিত-দ্বার রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদের উদ্ধারের জন্য ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এক অদ্ভুত নিরীশ্বর-বিবাহ আইন প্রণয়ন করিয়া দিয়াছেন!! তিনি মহাপণ্ডিতই হউন, বা একজন গণ্য মান্য ধনী ব্যক্তিই হউন, তাঁহার ধর্ম্ম-জীবন গঠিত না হইয়া থাকিলে, অর্থ লোভে বা লজ্জার খাতিরে তাঁহার নিরীশ্বর-বিবাহে কখনই যোগ দেওয়া উচিত নয়। নিরীশ্বর-বিবাহ, কেন বলিতেছি? যাহারা পরিণীত হইতেছে, তাহাদের যদি ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস

না জন্মিয়া থাকে, তবে তুমি হাজার বার মন্ত্র উচ্চারণ কর, হাজার বার উপাসনা কর—সে সকলকে আমরা নিরীশ্বর বিবাহ বলিবই বলিব। ধর্ম্মটা পুরোহিতে সম্পন্ন করিয়া যাইবে, আর বরকন্যা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও ধর্ম্মানুষ্ঠান হইবে, এ বিশ্বাস এখনকার দিনে আর বড় কাহারও নাই। সেই পুরোহিত যিনিই হউন, তাঁহার পূজা ও আরাধনার স্তোত্র বিশ্বাসহীন দম্পতীর বিবাহকালে সহস্র বার কণ্ঠ-নির্গত হইলেও, সে বিবাহ নিরীশ্বর বিবাহ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ধর্ম্মকে এইরূপে উপহসনীয় করিয়া তুলিতে পুরোহিতদল একটুও কুণ্ঠিত নন্! টাকার লোভে, যশের লোভে, ভাল-বাসার মায়ায়, হায় হায়, এইরূপে ধর্ম্ম অধর্ম্মের দ্বারা, পুণ্য পাপ কার্য্যের দ্বারা পরাজিত হইয়া, দেশের যে কি দুরবস্থা আনয়ন করিতেছে, কোন্ হৃদয়বান ব্যক্তি তাহা শোণিতাক্ষরে লিখিতেছেন? ব্যভিচার এবং দুর্নীতি, এইরূপে, ধর্ম্মের আচ্ছাদনে সমাজে চলিয়া যাইতেছে! কিন্তু কোন ধার্ম্মিক অভিভাবকের, বিশেষ অনুরোধেও, এ সকল কার্য্যে অভিমত দেওয়া উচিত নয়। লোক বিরক্ত হইবে বলিয়া, কোন ধর্ম্মপ্রধান সমাজের তাহা অনুমোদন করা উচিত নয়। অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে ২১ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে,আইন অনুসারে স্বেচ্ছাবিবাহ সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং আইন অনুসারেই বাধ্য হইয়া বিপথগামী বরকন্যাকে সংযত হইতে হইবে। ধর্ম্মজ্ঞান ভিন্ন মানুষের বিবাহিত-বোধ জন্মে না। পশুদের ধর্ম্মজ্ঞান নাই—তাহারা রিপুর উত্তেজনায় মা ভগিনী এ সকল গণনাও করে না! মানুষও যখন ধর্ম্মহীন,—মানুষ তখন মাতৃ-সহবাস না করুক, ভগ্নী-সহবাস পর্য্যন্ত করে!! শুনিয়াছি, বর্ম্মার কোন রাজা সহোদরা ভগ্নীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন! এতদূর পর্য্যন্ত মানুষের শোচনীয় অবস্থার কথা শুনা গিয়াছে! ব্রাহ্মসমাজের ভ্রাতাভগিনী সম্বন্ধের প্রতি বাহিরের লোকেরা অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া থাকে। যেরূপ দেখা যাইতেছে, পাতানে সম্বন্ধের পবিত্রতার প্রতি যে এই সমাজের লোকেরা একটা আস্থা দেখা-ইতে পারিতেছেন না, এ কথার বিরুদ্ধে আর কিছুই বলিবার নাই। আজ যিনি দাদা, কাল তিনি স্বামী,—এটা যে ভয়ানক গর্হিত কার্য্য, ইহা এ সমা-জের অনেকেই বুঝেন না। এইরূপ মধুর সম্বন্ধের গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতার প্রতি উপেক্ষা করিতে করিতেই শেষেই লোকের ততদূর অধোগতি হয়! এক দিনে কিছু লোকের একেবারে সর্ব্বনাশ হয় না। যাহা হয়, ক্রমে

ক্রমে হয়। ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলে মানুষ যে নরকের কীট হইয়া যাইবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ কি? অথচ এরূপ ভ্রাতা ভগিনীর বিবাহ নিরাপদে ব্রাহ্মসমাজে চলিতেছে। কি দুর্দ্দশা!

বড় আক্ষেপে এ সকল কথা লিখিতেছি। কোন সমাজ বিশেষের দোষ কীর্ত্তন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সত্যের অনুরোধে, দেশের এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য এ কথা না লিখিয়াই পারি না যে, কেবল বয়সের উপর বিবাহের ঔচিত্যানুচিত্য নির্ভর করিয়া যে সমাজ চলিতে চাহিবে, সে সমাজের পতন অনিবার্য্য। যে সমাজ নূতন আদর্শ-বিবাহ-প্রথা প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান, সে সমাজকে এ সকল বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া একান্ত উচিত। বাল্যবিবাহের স্থলে যৌবনবিবাহ প্রতিষ্ঠিত করিতে এই বঙ্গপ্রদেশে ব্রাহ্মসমাজ ব্রতী হইয়াছেন, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এই গুরুতর সংস্কার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে যে গভীর চিন্তার প্রয়োজন, যে গভীর ধর্ম্মজ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা বড় কম দেখিতেছি। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য সমাজের নানা কুপ্রথা অল্পে অল্পে অলক্ষিত ভাবে এই পবিত্র সমাজে প্রবেশ করিতেছে। বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যার ধর্ম্মজীবন দেখা ত দূরের কথা, তাহারা যথাভাবে কথোপকথন করিতেছে কি না, যথাভাবে একত্রে ভ্রমণ উপবেশন করিতেছে কি না, অভিভাবকের তাহাতে সম্মতি আছে কি না, এ সকলের প্রতিও দৃষ্টি অতি অল্প। স্থানে স্থানে দেখা যায়, বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যা এক বাড়ীতে অনেকদিন বাস করিয়াছেন, কিন্তু সমাজে তাহা দূষণীয় বলিয়া গণ্য হয় নাই। স্থানে স্থানে দেখা গিয়াছে, বিবাহের পূর্ব্বে স্বেচ্ছাক্রমে বর কন্যা একগাড়ীতে (অবশ্য কোচম্যান শূন্য গাড়ী নয়!!) উঠিয়া যেখানে সেখানে ভ্রমণ করিতেছেন, সমাজ সে সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপ করে নাই। কোন কোন স্থলে দেখা গিয়াছে, বিবাহের পূর্ব্বে বর, অভিভাবকের স্থানীয় হইয়া, কন্যাকে লালন পালন করিতেছেন! দেখা গিয়াছে, বিবাহের পর এই সকল বরই সমাজের শীর্ষ স্থানীয় হইয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছেন! সে বিষয় সমাজের নিকট উপস্থিত করিলেও, সমাজ সে সম্বন্ধে কোন প্রতিবিধান করেন নাই। এইরূপে দিন দিন নানা কদর্য্য আচার ব্যবহার এই পবিত্র ধর্ম্মসমাজ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। আমার বাড়া হয় কি তোমার বাড়া হয়, সে কথা তুলিয়া ঝগড়া করা বৃথা,—আমরা বলি, যার বাড়া হয়, তাহাকেই শাসন কর। আদর্শ

মত সমাজে প্রতিষ্ঠিত কর, তারপর যার জীবনে তাহা প্রতিপালিত না হয়, তাহাকে যে শাস্তি হয়, দাও। ব্রাহ্মসমাজে দুর্ঘটনা একটী দুটী হয় নাই। অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। আমরা সত্যের খাতিরে সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষার দোষে, আমরা এসকল প্রথার ভয়ানক বিরোধী হইলেও, আমাদের আশ্রিত বালক বালিকার মধ্যেও এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। আমরা এরূপ বর কন্যাকে ভয়ানকরূপ শাসন করিয়াছি, তার পর তাহারা আমাদের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে যাইয়া বিবাহ করিয়া বাসনা চরিতার্থ করিয়াছে! এই সকল কথা বলিয়া নাকি অনেক বাহাদুরী করিতেছে, তাই এস্থলে এই আভ্যন্তরিক কথা বলিলাম। আমরা তীব্র প্রতিবাদ করিতে যাইয়া অনেক বন্ধু ও অনেক আত্মীয়ের বিরাগভাজন হইয়াছি। সমাজে আন্দোলন করিয়া ফল না পাইয়া, দুইবার সভ্যের পদ ছাড়িতে পর্য্যন্ত বাধিত হইয়াছি। দেখিতে দেখিতে এই সমাজে বিলাতি চাল চল্‌তি কি এক ভয়ানক আধিপত্য বিস্তার করিতেছে! চতুর্দ্দিক হইতে গালিগালাজ বর্ষিত হইতেছে, তবুও চেতনা নাই। বিবাহের নিমন্ত্রণ আসিল—বর কন্যার সহিত কোন পরিচয় নাই, তাহারা কত দিন সমাজে আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাদের ধর্ম্মে প্রকৃত বিশ্বাস জন্মিয়াছে কি না, তাহারা চরিত্রবান কি না, তাহাদের বিবাহে অভিভাবকের সম্মতি আছে কি না, এ সকল সংবাদ না লইয়াই সকলে, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গমন করেন, এবং ব্রাহ্ম আচার্য্য উপাসনার ভার গ্রহণ করেন। অমনিই ব্রাহ্ম বিবাহ নামে সেই বিবাহ-সংবাদ পত্রে উঠিয়া যায়। বিবাহের অল্প দিন পর হয় ত কত গলদ বাহির হইয়া পড়ে! লোক দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষা পায়, লোকে বলে। কিন্তু এই সমাজের লোকেরা দেখিয়া, ঠেকিয়া তবু এ সম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন। ব্রাহ্মসমাজে দু দশ দিন যাপন করিতে না করিতেই বিবাহের আয়োজন চলিল! বিবাহই যেন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য! বিবাহটা অবশ্য কিছু দোষের নয়। কিন্তু ধর্ম্ম যদি বিবাহের লক্ষ্য না হয়, তবে তাহা যে পশুর আচার অপেক্ষাও ঘৃণিত, তাহাতে একটুও সন্দেহ নাই। কি দুঃখের বিষয়, যে আদর্শ দেখাইতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে জীবন্ত ধর্ম্ম ভাবকে এইরূপ কার্য্যকালে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া, নেতাগণ যে দেশের কি মহা অনিষ্ট করিতেছেন, কে তাহা ভাবিতে বসিবে? এ সকল কথা লইয়া বিশেষ আন্দোলন করার সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া লিখিতেছি।

ভিতরের আন্দোলনে বিশেষ কোন ফল হয় নাই, —হইবার সম্ভাবনাও নাই। আমরা দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়াছি, প্রবল দলের প্রবল মতের বিরুদ্ধে লাগিয়া জয়ী হওয়া সোজা কথা নয়। কাজেই সমগ্র দেশের নিকট এ সকল ব্যক্ত হইল। ব্রাহ্মসমাজের সহিত এদেশের নিতান্ত ঘনিষ্ট যোগ। আমরা দেখিতেছি, ব্রাহ্মসমাজকে আদর্শ স্থলে রাখিয়া অনেক বিষয়ে এদেশ অগ্রসর হইতেছেন। এখানকার হরিসভা প্রভৃতি একসময়ের ব্রাহ্মসভারই অনুরূপ। এক সময়ে যেরূপ আচার পদ্ধতি ব্রাহ্মসমাজে ছিল, এখনকার হিন্দুসমাজে সেইরূপ আচার ব্যবহার অলক্ষিত ভাবে চলিতেছে। এখনকার ব্রাহ্মসমাজ যেরূপ, আর ৩০ বৎসর পরে হিন্দুসমাজ যে সেইরূপ হইবে, তাতে আমাদের সন্দেহ নাই। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের দোষগুলির আলোচনা না করিলে এই হতভাগ্য দেশ যে কালে বিপথে নীত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং সর্ব্বসাধারণের পক্ষে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা উচিত। যৌবনবিবাহ যে ভাল, সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ নাই, কিন্তু কি প্রণালীতে বিবাহ সম্পন্ন হওয়া উচিত, নির্ব্বাচন-প্রণালীর মূলে ধর্ম্মজীবন না থাকিলে কি কি দুর্নীতি সমাজে প্রশ্রয় পাইতে পারে, এ সকল বিষয় শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। যেরূপ দেখা যাইতেছে, আজ কাল হিন্দুসমাজেও বর কন্যার কিছু অধিক বয়সে বিবাহ হইতেছে। বরের পণ দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয়, এদেশে সময়ে কন্যাজন্ম বিশেষ বিরক্তির হইবে এবং অর্থাভাবে কন্যাকে যথাসময়ে পাত্রস্থ করিতে না পারায় বয়স আরো খুব বাড়িয়া যাইবে। কতক পরিমাণে স্থানে স্থানে, মনোনয়ন-প্রথাও অলক্ষিত ভাবে একটু একটু চলিতেছে। আর ৩০।৪০ বৎসর পরে এই দেশে ঠিক ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় বরকন্যার অধিক বয়সে যে বিবাহ হইবে, তাহাতে বড় সন্দেহ নাই। তাহা প্রতিরোধ করারও সাধ্য নাই, কারণ অর্থাভাব প্রতিবাদী, সুতরাং কি প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, খুব গভীর ভাবে চিন্তা করা উচিত। ব্রাহ্মসমাজ এই গুরুতর বিষয়ে যেরূপ উদাসীন, এরূপ উদাসীন থাকাও আর উচিত নয়। এই সময় হইতে সতর্ক না হইলে, পাশ্চাত্য সমাজ সমূহের জঘন্য রীতিনীতিতে এ সমাজ ডুবিয়া যাইবে। পাশ্চাত্য সমাজের ধর্ম্মভাবহীন জঘন্য হাবভাবগুলি এ পবিত্র সমাজের ধর্ম্ম ও নীতিকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। পবিত্র আর্য্যভূমি স্বেচ্ছা-ভালবাসার অপকৃষ্ট অঙ্গে ভূষিত

হইয়া পশুর লীলাভূমি হইবে! ধর্ম্মের পুণ্যপ্রবাহ পাপ মরুভূমিতে পরিণত হইবে!! অতএব সাবধান, সাবধান!!!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাল্যবিবাহ, চন্দ্রনাথ বাবুর মত ও গৃহস্থাশ্রম।

আমরা স্বামী ও স্ত্রী নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, বিবাহপ্রথা সংস্কৃত না হইলে সমাজের মঙ্গল নাই। বিবাহপ্রথাকে সংস্কৃত করিতে হইলে বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিতে হইবে, যথাসাধ্য ইহাও বলিয়াছি। এই বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিবার পথে যে সকল অন্তরায় রহিয়াছে, আমরা কোন কোন সমাজের কোন কোন ঘটনার উল্লেখ করিয়া পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাহা দেখাইয়াছি। এই গুরুতর কর্ত্তব্য পালন করিবার সময় আমাদের নিজের ক্রটীর কথারও উল্লেখ করিতে হইয়াছে। কঠোর হইয়াও, সমাজের শিক্ষার দোষে, আমরা আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে সংযত-ব্রত শিক্ষা দিতে পারি নাই। কোন গুরুতর কর্ত্তব্যের অনুরোধে কেহ যদি কখনও কোন শ্মশানে আপন প্রাণপ্রতিম হৃদ্‌পিণ্ডকে বিসর্জ্জন দিতে পারিয়া থাকেন, তবে তিনিই বুঝিবেন, এই কঠিন কর্ত্তব্য পালন করিবার সময় আমাদের প্রাণে কেমন আঘাত লাগিয়াছে। সে সকল কথা লিখিয়া বুঝাইবার শক্তি নাই। অন্যান্য সমাজের উন্নতির সহিত ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হয়, ইহা আমাদের প্রাণগত কামনা। আমরা অন্যান্য সমাজের দোষের বিষয় উল্লেখ করিবার সময় যেরূপ ব্যথিত হই, এবার তদপেক্ষা কম ব্যথা পাই নাই। তাহার কারণ, আমাদের নিজের ক্রটীতে কোন অবৈধ ঘটনা ঘটিলে, তজ্জন্য আমরাই দায়ী। কিন্তু দুঃখ ও কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া বিবেক-বুদ্ধিতে যে কর্ত্তব্য বুঝিয়াছি, তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকা আরো অধর্ম্মের কাজ। অন্যের চরিত্রের দোষ বলিতে পারি, কিন্তু নিজের দোষ বলিতে পারি না;—অন্য সমাজের অবৈধ ঘটনা উল্লেখ করিতে দক্ষ, নিজ সমাজের বেলা দোষ চাপিতে প্রস্তুত;—এ অবস্থা আমাদের অসহ্য। আমরা যাহা, তাহা ভাল করিয়া জানিয়া ভালবাসিতে পার, বাসিও; না হয়, বাসিও না। ভুল বুঝাইয়া, ভালবাসা আকর্ষণ করাকে আমরা পাপ মনে করি

সত্যের জন্যই সত্যের আদর করিব। উনি, তুমি, সে,—কাহারও মুখের দিকে চাহিব না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ;—সত্যের বলেই সত্য জয়যুক্ত হইবে। আমাদের উদ্দেশ্য যদি সৎ হয়, তবে তাহাতেই লোকের মন আকৃষ্ট হইবে,—সত্যের জন্যই সত্যের প্রতি লোকের আদর বাড়িবে। মানুষের মুখ না চাহিয়া, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে পারিলেই বাঁচি।

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যৌবন-বিবাহের কেবল অন্ধকারময় অংশ চিত্র করিয়াছি। ইহার উজ্জ্বলতম অংশ চিত্র করাই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য, কারণ আমরা যৌবন বিবাহের পক্ষপাতী। অন্ধকারময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, ইহার উজ্জ্বল দিক নাই। পক্ষান্তরে যৌবন-বিবাহে কোথাও কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে নাই—আমরা ঈর্ষা-প্রণোদিত হইয়া অযথা মিথ্যা কথা রটনা করিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া দিতেছি,—এই সকল কথা বলিয়া যাঁহারা নানা উপায়ে আমাদের অনিষ্টের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা, তাঁহারা আমাদিগকে শত্রু মনে করিলেও, আমরা যেন চিরকাল তাঁহাদিগকে বন্ধুর ন্যায় মনে করিতে পারি। একই লক্ষ্য, একই উদ্দেশ্য যখন—তখন আমাদের অন্য কামনা হইলে, তাহা অমার্জ্জনীয়। প্রণালীগত বিভিন্নতাতে কিছু আসিয়া যায় না।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি যে, বিবাহের লক্ষ্য যদি ধর্ম্ম-সাধন বা মুক্তি না হয়, তবে বিবাহে সমাজের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে নানা প্রকার অমঙ্গল ঘটে। এ কথাতে অনেকের আপত্তি আছে, এবং থাকিতে পারে। প্রকাশ্যভাবে সে সকল আপত্তির কথা না শুনিয়া উত্তর দিতে চাই না। ধর্ম্মসাধন বিবাহের লক্ষ্য, এ কিরূপ কথা?—কেহ কেহ বলিতে পারেন। এ কথার যথাসাধ্যি উত্তর দেওয়া উচিত, মনে করিতেছি।

মানুষ কতকগুলি কর্ত্তব্য পালনের জন্য জন্মগ্রহণ করে। জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষ সেই কর্ত্তব্য পালনে তৎপর। ভাল করে, কি মন্দ করে, আমরা তাহা জানিনা; এই মাত্র জানি, মানুষ আপন কর্ত্তব্য পালনের জন্য সদাই ব্যস্ত, সদাই উৎকণ্ঠিত। এই কর্ত্তব্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীর মন উন্নত হয়। শরীর মনের সহিত

আত্মাও উন্নত হয়। পাপ প্রলোভন হইতে রক্ষা পাইয়া উন্নতি হইতে উন্নতিতে যাওয়াই আত্মার মুক্তি; সুতরাং এই সংসার-সাধন—মুক্তি-রই জন্য। "কে স্ত্রী, কে পুত্র, কে পিতা, কে মাতা?"—মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদের এই অপূর্ব্ব কাহিনী সহস্রবার শুনিয়া, ও মালথাসের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বিবাহ, সুতরাং দেশের দারিদ্র্যের একটী হেতু যে বিবাহ, ইহা বুঝিয়াও মানুষ বিবাহের মমতা ছাড়িতে পারে না। পুরুষ ও প্রকৃতি মিলিত হইয়া ক্রমাগত মানুষকে মোহ হইতে মুক্তিতে, আসক্তি হইতে উন্নতিতে লইয়া যাইতেছে। কেহ তাহা বুঝে, আর কেহ তাহা বুঝে না। যে বুঝে, সে এই সকলের মধ্যে এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে দেখিয়া বিস্ময়ে নিমগ্ন হইয়া যায়। পিতা মাতার গভীর প্রেম, আত্মীয় বন্ধুর মধুর ভালবাসা, এবং ভ্রাতা ভগ্নীর স্নেহের পার্শ্বে সে দেখে—স্বর্গ হইতে প্রেমের আর একটী অনাবিল পবিত্র প্রবাহ যেন ছুটিতেছে! পুরুষ তখন স্ত্রীতে মজে। সংসারের জন্য নয়, স্বর্গের জন্য। অবিশ্বাসী ব্যক্তি জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে দারিদ্র্য বৃদ্ধি হয় জানিয়া ভয় পায়, ইহাতে বিধাতার লীলা দেখে না। কিন্তু ভারতবর্ষের বিশ্বাসপ্রধান শাস্ত্র ইহার জীবন্ত প্রতিপাদ করে। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা বিবাহবন্ধনকে, ধর্ম্মেরই একটী বন্ধন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চিন্তা ও বহুদর্শিতার ফলে পৃথিবীর মধ্যে হিন্দুপত্নী এক সময়ে এক আশ্চর্য্য সামগ্রী ছিলেন। সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "হিন্দুপত্নী এবং বিবাহের বয়স" ইত্যাদি নামক প্রবন্ধ দুটীতে প্রসঙ্গক্রমে অনেক সারগর্ভ মূল্যবান কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে সকল পাঠ করিলে মোহিত হইয়া যাইতে হয়। দুই চারি স্থলে তাঁহার সহিত আমাদের কিছু মতের অনৈক্য হইয়াছে। ক্রমে তাহা ব্যক্ত করিতেছি।

চন্দ্রনাথ বাবু বিবাহের অতি উচ্চ আদর্শ চিত্রিত করিয়াছেন; কিন্তু তিনি এ কথাটী ভাবেন নাই যে, হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকা স্বত্তেও হিন্দুপত্নীর বর্ত্তমান সময়ে এত দুরবস্থা কেন? একথার উত্তর না পাইয়া আমরা কিছু ব্যাকুলিত হইয়াছি। তিনি মনু হইতে শ্লোক তুলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, "৩০ বৎসরের পুরুষ দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে।" দেখাইয়াছেন যে, এই ত্রিশ বৎসর কাল

পুরুষ জ্ঞানার্চ্চনায় নিযুক্ত থাকিবেন। তিনি বালিকার অল্পবয়সে বিবাহের প্রয়োজনীয়তার এইরূপ একটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, 'হিন্দুপরিবার একান্নবর্ত্তী, হিন্দুপত্নী কেবল পতির জন্য নয়, কিন্তু পরিবারের জন্যও। পতির পরিবারের সকলের সহিত পত্নীর আত্মীয়তা বৃদ্ধি হওয়া উচিত। অধিক বয়সে তাহা হয় না।' এ কথাটা কি ঠিক? প্রথমতঃ, পত্নী কেবল পরিবারের জন্যও ত নয়, কতক পতির জন্যও ত; সুতরাং স্ত্রী পতির ভালবাসার উপযোগিনী কি না, পতি স্ত্রীর ভালবাসার উপযুক্ত কি না, ইহা কেবল অভিভাবক নির্দ্দেশ করিলেই ঠিক হয় না; ইহাতে বর কন্যারও কতক মতামত থাকা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, অল্প বয়স্ক হইলে পত্নী পতির পরিবারকে ভালবাসিতে পারিবেন, এ কথাটাও ঠিক নয়। ভালবাসার শাস্ত্রই এরূপ নয়। আমাদের বিবেচনায়, স্বামীকে যখন স্ত্রী প্রকৃতরূপে ভালবাসিতে শিখে, তখনই স্বামীর প্রিয় বস্তু স্ত্রীর প্রাণের জিনিস হয়। অনেকদিন এক পরিবারে থাকিলেই সকলকে কিছু ভালবাসা যায় না। এক ঘরে থাকিয়াও লোক সমুদ্র পারে, আর সাত সমুদ্র পারে থাকিয়াও প্রাণের ভিতরে থাকিতে পারে—কেবল ভালবাসার তারতম্যে! ভালবাসার শাস্ত্রই স্বতন্ত্র। ঈশ্বর-প্রদত্ত বিধানের মর্ম্মভেদ না করিতে পারিলে এ শাস্ত্রে জ্ঞান জন্মে না। পিতা মাতাকে যে সূত্রে বালক বালিকা ভালবাসে, সে সূত্র ধরিয়া পাড়াপড়্সির সকলকে কিছু ভালবাসিতে পারে না। সে সূত্র ভগবানের বিধান। সেই বিধানের স্রোতে পড়িয়াছি, এ জ্ঞান না জন্মিলে স্ত্রীও স্বামীর পরিবারকে ভালবাসিতে পারে না। দৃষ্টান্তের জন্য দূরে যাইতে হইবে না। বাল্যবিবাহ এদেশে আজও প্রচলিত আছে, কিন্তু কই, সেরূপ গভীর ভালবাসা কই?—সেরূপ আত্মীয়তা কই?—ঝগড়া কলহ বিবাদে অনেক হিন্দু পরিবারের আজ যে কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত, চন্দ্রনাথ বাবুর ন্যায় একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যে তাহা বুঝিতেছেন না, আমরা তাহা মনে করিতে পারি না। চন্দ্রনাথ বাবু যে ধর্ম্মবন্ধনের কথা বলিয়াছেন, আমরাও তাহাকেই বিবাহের লক্ষ্য মনে করি। হিন্দু-শাস্ত্রকারগণের সহিত এ সম্বন্ধে আমাদের একটুও মতের অনৈক্য নাই। তবে আমরা মনে করি, বালিকাদের অল্পবয়সে বিবাহ হইলে তাহারা এই উচ্চতর লক্ষ্য কিছুই বুঝিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের বিবাহের

মন্ত্র পাঠ কথার কথার ন্যায়—জীবনে তাহার সুফল বড় ফলিতে দেখা যায় না।

বালিকার অল্পবয়সে বিবাহের দ্বিতীয় কারণ, চন্দ্রনাথ বাবু এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—"হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য পতি পত্নীর একীকরণ, হিন্দুপত্নী পতির সহিত মিলিয়া এক হইয়া যাইবেন। বয়ঃস্থ পতি বিবাহের পর বালিকা পত্নীকে গড়াইয়া পিটাইয়া আপনাতে মিশাইয়া লইবেন।" একথাটীরও অর্থ আমরা বুঝিলাম না। গড়াইয়া পিটাইয়া যে ভালবাসা বৃদ্ধি করা যায়, আমরা মনে করিতে পারি না। এত আর ধাতু নয় যে, চেষ্টা করিলেই মিশ্রিত করা যাইবে। পতি পত্নীর একাত্মক-ভাব সাধনের আমরা পক্ষপাতী, উভয়কে পৃথক পৃথক করিয়া রাখিবার পক্ষপাতী নই। এস্থলে স্বাধীনতা ও সাম্যবাদে গরল উৎপন্ন হয়, ইহাও জানি। স্বাধীনতা ও সাম্যবাদে পাশ্চাত্য জগতে বিবাহ-বন্ধন-প্রথা যে কতক পরিমাণে শিথিল-দশা প্রাপ্ত হইয়াছে—তাহাতে আমাদের বড় সন্দেহ নাই (১)। স্বাধীনতা ও সাম্যের বিশ্ব বিমোহিনী শক্তিতে সেখানে দারুণ কুফল ফলিতেছে। বিবাহ-ভঙ্গ প্রথার প্রবল স্রোতে সমাজ উলট পালট হইয়া যাইতেছে। আমরা ঐরূপ স্বাধীনতাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। আমরা পতি পত্নীর পৃথক অস্তিত্ব দেখিতে চাই না। এক মত, এক ভাব, এক প্রাণ; এক মন, এক ধ্যান পতি পত্নীর না হইলে সমাজের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। পতি পত্নীর কর্ত্তব্য এবং জীবনের লক্ষ্য একরূপ না হইলে, পরিবারে শান্তি থাকে না। পতিত্ব স্ত্রীত্বে, স্ত্রীত্ব পতিত্বে মিশান চাই। উভয়ের মন উভয়কে দেওয়া চাই। কিন্তু অপরিপক্কবুদ্ধি বালিকা কিরূপে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মিলাইয়া পতিত্বে মিশিবেন, আমরা বুঝি না। অধিক বয়স না হইলে ভাবী প্রকৃতি নির্ণয় করাও কঠিন। বালিকা ভবিষ্যতে কিরূপ হইবে, ইহা বিজ্ঞ অভি-ভাবকের পক্ষেও নির্দ্ধারণ করা কঠিন। বর কন্যার একীকরণের জন্যও সুতরাং উভয়ের মতামত গ্রহণ করা বড়ই দরকার। উভয়ের অধিক বয়স না হইলে, এবং উপযুক্ত জ্ঞান না জন্মিলে পরস্পরকে হৃদয় ও মন দান করিতে পারা অসম্ভব। বালিকা-বিবাহ প্রচলিত থাকার জন্যই আজ কাল

(১) "Those among the higher classes, who live principally in towns, often want the inclination to marry, from the facility with which they can indulge themselves in an illicit intercourse with the sex."

Malthus on Papulation.

পতি পত্নীর বড় একটা মতের মিল দেখা যাইতেছে না। এই কারণেই বর্ত্তমান সময়ে, হিন্দু পতি পত্নীর মধুর সম্বন্ধ, অনেক স্থলে, মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য-শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

পতি মনে করিলেন, স্ত্রী আমার, কেবল তাহাতেই হইল না; স্ত্রীও মনে করিবেন যে, পতি আমার। পতি মিলিবেন, পত্নীতে; পত্নী মিলিবেন, পতিতে। দুয়েরই অস্তিত্ব থাকিবে—অথচ দুই মিলিয়া একাকার হইবে। একের পিঠে এক যোগ করিয়া এগার হইবে। একের অস্তিত্ব অন্যে ডুবিয়া যাইলে প্রকৃতির শোভা থাকে না,—উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। পতি, পত্নীর মনে মিলিবেন; পত্নী পতির মনে মিলিবেন। অথবা উভয়ের মনে মিলিয়া একটী স্বতন্ত্র মন হইবে। রাসায়নিক সংযোগে ধাতু পরস্পর মিলিয়া যেমন স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে, এখানেও তদ্রূপ হইবে। হর-গৌরী মিলিয়া একাত্মক হইয়া যাইবেন। ইহাকেই পূর্ণ মানুষ হওয়া বলে। পুরুষ পূর্ব্বে যেমন ছিল, পত্নী লাভের পরও তেমনই রহিল, পত্নী কেবল তাহাতে যুক্ত হইয়া মিলিয়া রহিলেন, ইহাতে পূর্ণমানবত্ব সাধিত হয় না। রাম যিনি, তিনি রাম। সীতা যিনি, তিনি সীতা। বিবাহের পর কথা হইল—"রাম সীতা।" এখানে বাল্মীকি উভয়ের অস্তিত্ব, উভয়ের প্রকৃতির কমনীয়তা, উভয়ের প্রকৃতির সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়াছেন। সীতা হইলেন রামপ্রাণা, রাম হইলেন সীতা-প্রাণ;—বাল্মীকি এই রূপ কবিত্বময় আর্য্যবিবাহের কি এক আশ্চর্য্য ছবি জগতের সম্মুখে ধরিয়াছেন! বর কন্যা উভয় সমবয়স্ক এবং অধিক বয়স্ক না হইলে যে কেমনে এইরূপ মধুর মিলন হইতে পারে, আমরা বুঝি না। রাম সীতা উভয়ই অধিক বয়স্ক ছিলেন। পতির অধিক বয়স, এবং বালিকার অল্প বয়স হওয়া উচিত কেন?—এ কথার উত্তরে চন্দ্রনাথ বাবু যাহা বলিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় তাহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। বর কন্যা উভয়ই অধিক বয়স্ক হইলে এইরূপ মিলন যে সুন্দর হয় না, একথা চন্দ্রনাথ বাবু কি প্রমাণ করিতে পারেন? ছোট শিশু ছোট শিশুকে চায়, বালক বালককে চায়, যুবক যুবককে চায়। বিধাতার নিয়মে—সম বয়স্কের প্রতি সমবয়স্কের একটা প্রাণের টান চিরকাল জগতে রহিয়াছে। বিশেষত, বিবাহের মিলন শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি, ও আধ্যাত্মিক শক্তি বিকশিত না হইলে মিলন কেমনে সুন্দর হইবে, বুঝিনা। ধর্ম্মবোধ না জন্মিলে ধর্ম্ম-মিলনই বা কেমনে হইবে? যৌবন নামে মানুষের জীবনে যদি একটী বিশেষ অবস্থা না

ঘটিত, তবে কি হইত, জানিনা। যৌবন, বিধাতার নিয়ম। এই সময়ে পুরুষ রমণীর প্রতি, এবং রমণী পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হইতে চায়। এই বিধানকে অগ্রাহ্য করিলে মিলন কি সম্ভবপর? চন্দ্রনাথ বাবুর লেখায় কবিত্ব যথেষ্ট আছে, কিন্তু যুক্তিতে কিছু একদেশদর্শিতার ছায়া আছে বলিয়া মনে হয়। সীতা, ইন্দুমতী, সুভদ্রা, রুক্মিণী, গান্ধারী, দেবযানী, প্রমদ্বরা, পৃথা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, এ সকল আর্য্য সতীর আদর্শ রমণীগণ যে যৌবন-বিবাহের ফল, (১) এ কথাটী তাঁহার মনে রাখা একান্ত উচিত ছিল।

বালিকা পত্নীকে যদি উপযুক্ত রূপে শিক্ষা দিয়া নিজের ন্যায় করিতে পারা যায়, তবে চন্দ্রনাথ বাবুর উদ্দেশ্য কতক সাধিত হইতে পারে। এই শিক্ষার জন্যই তিনি বালিকা বিবাহের পোষকতা করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ শিক্ষার এ দেশে প্রচলন নাই। থাকিলেও বলিকাকে শিখাইয়া ঠিক নিজের ন্যায় করা যায় কি না, সন্দেহ। সুতরাং তাঁহার এ কথাটাও কিছু এক-দেশদর্শী। অন্য দিকে পত্নী পতিকে কতক শিখাইবেন, এ কথা হইল না কেন? অথবা পত্নী পতিকে আপনাতে মজাইবেন, এ কথাই বা হইল না কেন? পত্নীর মধ্যেও এমন কিছু আছে, যাহা পতির নাই, চন্দ্রনাথ বাবু স্বীকার করিয়াছেন, সেই কিছু পতিকে দিবার জন্য পত্নী অধিকারী নন্ কেন? বালিকা বলিয়া নয় কি? এ স্থানেও আমরা তাঁহার যুক্তিতেই বলিতে পারি, উভয়ের অধিক বয়স হইলেই পরস্পরকে কতক নিজের উপ-যোগী করিবার শক্তি জন্মে। সুতরাং যৌবন-বিবাহই অধিক যুক্তিযুক্ত। পত্নীকে দেবতার ন্যায় ব্যাখ্যা করিয়াও চন্দ্রনাথ বাবু পতিকে শিখাইবার অধিকার পত্নীকে দিতে প্রস্তুত নন্। এইরূপ স্থানে সাম্যবাদের কথা তিনি কেন যে ভুলিয়া যান, বুঝিনা। এইরূপ একদেশদর্শিতায় পতি-কুলের উপর পত্নীকুলের কোনই হাত থাকে না। ইহাতে সমাজে যে কি অবৈধ আচরণ চলিতেছে; তাহা না বলিলেও চলে। পতির সম্পত্তি স্ত্রী, কিন্তু স্ত্রীর সম্পত্তি পতি নহেন। বেশ কথা। উভয়ে প্রকৃতিগত অনেক বৈষম্য আছে; এটীও বেশ কথা। পত্নী যখন পতিতে মিলিবেন, তখন পতিত্বের উপযোগিতা পতিতে আছে কি না, ইহাও কি একবার দেখিবার উপযুক্ত পাত্রী পত্নী নন্। এই স্থানে আমরা তাঁহার সহিত

(১) See Hygiene and Public Health in Bengal Vol II. Page 130 by Surgeon D. Basu.

মিলিতে পারি না। বিশেষতঃ ধর্ম্ম ও মুক্তিই যখন হিন্দু বিবাহের লক্ষ্য, পরোপকার-ব্রত সাধনই যখন গৃহস্থাশ্রমের উদ্দেশ্য—তখন পতি পত্নী উভয়েরই তাহা হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। দায়িত্ব বুঝিয়া তারপর উভয়ের সে দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত; নচেৎ বিবাহ অসম্পূর্ণ থাকে। দায়িত্ব না বুঝাতেই অসম-বয়স্ক হিন্দু বিবাহে অধিকাংশ স্থলে দারুণ গরল উৎপন্ন করিতেছে (১)। পতি পত্নীতে বিরোধ,—স্ত্রী বিয়োগে পতির পুনর্ব্বার পত্নী গ্রহণ, পতি বিয়োগে বিধবার কুলধর্ম্ম ত্যাগ, ভ্রূণহত্যা বা বাল্যকালে অধিক মৃত্যুসংখ্যা ইত্যাদি, এ সকল অসম-বিবাহ বা বাল্যবিবাহেরই শোচনীয় ফল (২)। এ সকল যে সমাজের পক্ষে পরম অমঙ্গলকর, ইহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব আমাদের বিবেচনায়, মনুতে পুরুষের যেরূপ অধিক বয়সে বিবাহের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, চরক শুশ্রুতের নির্দ্দেশানুসারে কন্যারও সেইরূপ অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া একান্ত উচিত।

চন্দ্রনাথ বাবু আর একটী অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন,—"শারীরিক প্রয়োজনে যে বিবাহ করে, বালিকা পত্নী তাহার জন্য নয়।" মূল মতের সহিত আমাদের অনৈক্য নাই। কেবল শারীরিক প্রয়োজনে বিবাহ হইলে সমাজের মঙ্গল হইতে পারে না, এ কথা ঠিক। কিন্তু শারীরিক প্রয়োজনে যে পুরুষেরা আজকাল বিবাহ করিতেছে না, সে কথা কি চন্দ্রনাথ বাবু বলিতে পারেন?—না, তিনি তাহা বলেন না। রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতার প্রতিবাদে তিনি বলিয়াছেন যে, পুরুষেরা দুর্দ্দমনীয় রিপুর উত্তেজনায় অনেক পৈশাচিক ব্যবহারে বিবাহের নামে কলঙ্ক আনয়ন (৩) করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার কথাতেই তাঁহার কথা কাটা যাইতেছে। শারীরিক প্রয়োজন যখন পুরুষেরা সময়ে অসময়ে সধিত করিয়া লইতেছে, তখন বালিকা পত্নীর পরিবর্ত্তে, এক হিসাবে, যুবতী পত্নী

(১) Hygiene, Vol. II by D. Bosu. Page, 142, 143 and 145 and Hygiene by F. A. Parkes. P, 461.

(২) "More than one-fifth of all the girls in India, are therefore either wives or widows, but the influence of the great mortality incident to the years of tenderest infancy must not be forgotten in considering these figures." H. Goodrich.

(৩) নবজীবন-চতুর্থ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা-২২২ পৃষ্ঠা। যৌবনে পদার্পণ করিয়া বালিকার বিবাহ করায় আরো যে সকল দুর্নীতি ও কদাচার দেশে চলিতেছে, তাহার বিবরণ ধর্ম্মদাস বাবুর স্বাস্থ্যরক্ষা-দ্বিতীয় ভাগের ১৪১ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

দেওয়াই উচিত। বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতার অন্যবিধ কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু বাল্য-বিবাহ যে একটী কারণ নয়, এ কথা চন্দ্রনাথ বাবুই কি সাহস করিয়া বলিতে পারেন? এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পৃথক পরিচ্ছেদে করিব। তারপর তিনি বলেন, একান্নবর্ত্তী পরিবারের অনুরোধে অল্প বয়সে বালিকার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। এ কথার উত্তর কতক পূর্ব্বে দিয়াছি। অবোধ বালিকাদিগকে অসময়ে বিবাহবন্ধনে বাঁধিয়া, হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবারে আনয়ন করিয়া যে ভালবাসা সূত্রে বাঁধা যাইতেছেনা, এ দৃষ্টান্ত এদেশে আজ কাল বড় বিরল নয়। বালিকা বিবাহ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও পরিবার-বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে— এ কথাটী চন্দ্রনাথ বাবু একবার ভাবিয়া দেখিবেন। আমরা বলি, বালক বালিকারা দায়িত্ব বুঝিয়া যদি দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যভার মস্তকে না লয়, তবে তাহাদের দ্বারা কর্ত্তব্য সুশৃঙ্খলামতে পালিত হইবে, কখনই আশা করা যায় না। বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য ধর্ম্ম এবং সমাজের উপকার সাধন। অতি গুরুতর কথা, অতি সুন্দর কথা। অন্যের সেবার জন্য এবং নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যাঁহারা মিলিত হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জন সে দায়িত্ব কিছুই বুঝিতেছেন না! এই জন্যই, বোধ হয়, হিন্দু পত্নীর গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিতেছে না। চন্দ্রনাথ বাবুকে এ কথাটী এক বার ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

কিন্তু কেবল বয়স লক্ষ্য হইলেই চলিবে না, শরীরের সহিত মানসিক উন্নতি,—ধর্ম্ম, নীতি, চরিত্রের উন্নতি ও প্রকৃত জ্ঞানলাভ না হইলে বিবাহের প্রস্তাবই উঠিতে দেওয়া উচিত নয়। একবাব বিবাহের পর আর বিবাহ হইবে না—এইরূপ নিয়ম পতি পত্নী উভয়ের সম্বন্ধে প্রচলিত হইলে, উভয়ে গুরুতর দায়িত্ব বুঝিয়া একত্ব-সাধনের পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন। বিলাতী বিবাহের মূল আত্ম-সুখান্বেষণ, চন্দ্রনাথ বাবু বলেন। সেই জন্য তিনি যৌবন-বিবাহকে ঘৃণা করেন। হিন্দু বিবাহ উদ্দেশ্যমূলক। কিন্তু এই মহৎ উদ্দেশ্য কি বর কন্যার পরিণীত হইবার পূর্ব্ব উভয়েরই হৃদ্‌বোধ হওয়া উচিত নয়? দায়িত্ব না বুঝিয়া যে দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহার সে দায়িত্ব গ্রহণের কোন মূল্য নাই। দায়িত্ব বুঝাইবার জন্য, মহৎ উদ্দেশ্য হৃদবোধ করাইবার জন্য যৌবন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। কেবল পুরুষের পক্ষে নয়, রমণীর পক্ষেও প্রয়োজনীয়।

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে অন্যান্য যে সকল যুক্তি আছে, তাহার আলোচনা পৃথক পরিচ্ছেদে করিব।

আমাদের বিবেচনায়, হিন্দু বিবাহে খুব সুফল ফলিত, মহৎ উদ্দেশ্যের সহিত যদি তাহা প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইত। অপরিণত বয়সে বিবাহ হওয়ায় বালক বালিকার প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান হয় না। ধর্ম্ম বিবাহের লক্ষ্য, একথা মনু বলিয়াছেন, শাস্ত্রকারেরা জানিতেন; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ স্থলে বর কন্যার সে সম্বন্ধে জ্ঞান অতি অল্প। এই কারণে হিন্দু বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও, অসমবয়স্ক বা বাল্য বিবাহে আশানুরূপ মঙ্গল প্রসূত হইতেছে না। অনেক স্থলে পতি পত্নীর মধ্যে গাঢ় ভালবাসার অভাব দেখা যাইতেছে—এবং অনেক স্থলে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা অতি অশান্তির জিনিস হইয়া উঠিতেছে।

এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে এবং তৎসহ বিবাহ-সংস্কার-প্রশ্ন বা যৌবন-বিবাহের কথা উঠিয়াছে। যৌবনবিবাহ প্রথা প্রচলিত করিতে যাইয়া, এই হতভাগ্য দেশে, ব্রাহ্মসমাজকে পদে পদে লাঞ্ছিত হইতে হইতেছে। বিপদের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে পদে পদে ভ্রূকুটী দেখাইতেছে। স্থানে স্থানে নানাপ্রকার দুর্ঘটনাও ঘটিতেছে। কিন্তু তবু একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রাহ্মসমাজ এই বিবাহ সংস্কার ব্রতে ব্রতী হইয়া দেশের ভবিষ্যতের মহৎ উপকার সাধন করিতেছেন। একদিনে কিছু অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, এক দিনে কিছু দেশের আমূল সংস্কার হয় না। একদিনে কিছু লোকের ধর্ম্মে মতি হয় না। হাজার বার পতন হইলেও, সেই পতনের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া বলিব যে, যৌবন-বিবাহ ভিন্ন আর কোন বিবাহে বিবাহের গুরুতর উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না,—হইবার নয়। যে সময় হইত, সে সময় চলিয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজে যৌবনবিবাহ প্রচলিত হওয়াতে স্থানে স্থানে যে অমঙ্গল ঘটিতেছে, একথা আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। নিরাশার কথা বলিয়াছি বলিয়া যে আশার কথা নাই, তাহা নয়। নিরাশার কথা অপেক্ষা আশার কথা সহস্রগুণে অধিক। দুঃখের ধারেই সুখ, নিরাশার ধারেই আশা। আমরা বিবাহের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিতে চাই, তাহা না হইয়া থাকিলেও, যতদূর হইয়াছে, যে কোন সমাজ তাহাতে গৌরব করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে উচিত নয়।

ব্রাহ্মসমাজ তাহাতেই সন্তুষ্ট; ইহা ঠিক বলিয়া মনে করিতে পারি না। কোন সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এই সকল বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি এক প্রকার বিফল-মনোরথ হইয়া এক ধারে সরিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছেন। ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, বিবাহকে ধর্ম্মানুরঞ্জিত না করিলে আর উপায় নাই। এসম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ যে কতক পরিমাণে উদাসীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সকল কথা এ পরিচ্ছেদে থাকুক।

গৃহস্থাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করা ব্রাহ্মসমাজের একটী প্রধান লক্ষ্য। পরিবার প্রতিপালন করিয়াও প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন করা যায়, গত পঞ্চাশৎ বৎসর ব্রাহ্ম সমাজ ইহাই প্রচার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কি করিলে আদর্শ গৃহস্থাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে,—এক দিকে দৈনিক অতিথি সেবা, অন্য দিকে পরিবার প্রতিপালন;—এক দিকে জ্ঞান চর্চ্চা, অন্য দিকে পূজা অর্চ্চনা রূপ ধর্ম্ম সাধন, এই সকল গুরুতর কর্ত্তব্য পালনের পক্ষে গৃহকে কিরূপ সুশোভিত করা উচিত, এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ কিছু উদাসীন। ধর্ম্মকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতে হইলে এই রূপ ব্যাখ্যা করা যায়—"নামে রুচি ও জীবে দয়া।" এটী মহাত্মা চৈতন্য দেবের কথা। নামে রুচির মূলে জ্ঞান ও বিশ্বাস। জীবে দয়ার মূলে প্রেম ও কর্ম্ম। জ্ঞান-বিশ্বাস, প্রেম ও কর্ম্মই—ধর্ম্মের মূল। বিশ্বাস, জ্ঞান চর্চ্চার আয়োজন, এবং নানা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রতি গৃহস্থাশ্রমের লক্ষ্য। ব্রাহ্মসমাজ ইহার উৎকর্ষ সাধনে কতক চেষ্টা করিতেছেন। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সে বিচারের প্রয়োজন নাই। পাশ্চাত্য সমাজের শিক্ষার সহিত স্বার্থ চিন্তা কতক পরিমাণে এই সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। এই স্বার্থের সহিত বিষম সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া যাওয়ায়, কার্য্যত, আশানুরূপ প্রেমের উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে না, আমরা বুঝিতেছি। বিশেষত, আত্মীয় পরিজনকে ছাড়িতে বাধ্য হইয়া অনেকে প্রেমের মূলে কতক আঘাত করিয়াছেন। যাহাদিগের সহিত রক্তমাংসের সংশ্রব নাই, উচ্চ ধর্ম্ম জ্ঞান ভিন্ন তাহাদিগকে আপনার বলিয়া ভাবিতে পারা বড়ই কঠিন। সুতরাং, অনেক স্থলে, পূর্ব্বে হিন্দু গৃহে অতিথি সেবার প্রতি যেরূপ একাগ্র অনুরাগ ছিল এবং এখনও যেরূপ আছে, ব্রাহ্মসমাজে সেরূপ দেখা যায় না। ব্রাহ্ম পরিবার—পতি পত্নী হইতে আরম্ভ। পিতা মাতা আত্মীয় কুটুম্বদিগকে লইয়া অতি অল্প লোকেই ব্রাহ্ম হইয়াছেন। গৃহকে

প্রেমালয় করিবার জন্য এখানে একরূপ দায়ী কেবল পতি ও পত্নী। গৃহকে প্রেমালয় করিতে হইলে, পতিপত্নীকে, বিশেষ ভাবে, এই জন্যই বলি, প্রস্তুত হইতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নানা কারণে, ব্রাহ্মসমাজ সেরূপ শিক্ষা দিতেছেন না।

এই পৃথিবীতে টাকা কড়ি আমার কিছুই নয়—এ সকলই অন্যের সেবার জন্য—এই উচ্চ চিন্তা সকলের মধ্যে স্থান পাইবে, বড় আশা করা যায় না। গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে কেবল নিজের জন্য নয়, অন্যের সেবার জন্যও। আমরা বিবাহিত হইতেছি, কেবল নিজেদের সুখের জন্য নয়, কিন্তু সমাজের ও দেশের মঙ্গলের জন্যও ;—প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রকারগণের এই গভীর ধর্ম্মভাব মূলক কথাগুলি আধুনিক সমাজ সমূহে উপহাস্য হইয়া উঠিয়াছে। যে কারণে গৃহস্থাশ্রমকে আর্য্য ঋষিগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, সে গুলি এখন ঠাট্টা বিদ্রূপের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। নিজের বিলাস সুখ লইয়াই আমরা ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি। যিনি মাসে ১০০০ উপার্জ্জন করেন, তিনিও নিজের সুখ স্বচ্ছলতা লইয়াই অধিক ব্যস্ত, যিনি মাসে ১০ টাকা পান, তিনিও তাহাই। বিলাস সুখের আশা মিটিবার নয়, তাহা মিটে না। সুতরাং আয় বৃদ্ধির সহিত বিলাস-সুখ-আশা মিটাইবার চেষ্টাই অধিক হয়। ধর্ম্মসমাজের পক্ষে এ সকল যে ভয়ানক দোষের কথা, আমরা অনেক সময়ে তাহাও বুঝি না। ইহার একমাত্র কারণ, আমরা পূর্ব্ব হইতে সেরূপ শিক্ষিত হই নাই। গৃহ প্রতিষ্ঠার সময় অর্থাৎ বিবাহের সময় বর কন্যা অতি অল্প স্থলেই সেরূপ ভাবে শিক্ষিত হন্। দেশের হিত সাধন বা প্রচার ব্রত যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা বিবাহিত হইলে যে আরো মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, এ চিন্তাটার আদর দিন দিনই কমিয়া যাইতেছে। বিবাহিত হইলে লোক আরো স্বার্থপর হইবে,—এরূপ আশঙ্কাই অনেকের মনে বদ্ধমূল হইতেছে। সমাজের চিন্তাই কিছু বিভিন্ন-পথগামী হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার এটী একটী বিষম কুফল। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে] নিজ সুখ লইয়াই অনেকে ব্যস্ত। দয়ার কার্য্য সেখানে কমিটীর দ্বারা নির্ব্বাহিত হয় ; দৈনিক জীবনে ব্যক্তিত্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ অতি অল্প। আধুনিক বঙ্গ সমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রতি যেরূপ লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিতেছে, দৈনিক অতিথি-সৎকার প্রথার প্রতি যেরূপ ঘৃণা উৎপন্ন হইতেছে, ইহাতে প্রেম-সাধনের পক্ষে যে ভয়ানক

অন্তরায় উপস্থিত হইবে, আশ্চর্য্য কি? ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু সমাজেরই প্রতিকৃতি মাত্র। সুতরাং এই সমাজেও প্রেম সাধনের যে আশানুরূপ উপায় অবলম্বিত হয় নাই, ইহাতে দুঃখের কথা থাকিলেও, আশ্চর্য্যের কথা নাই। ব্রাহ্মসমাজে ব্যক্তিগত স্বত্ব রক্ষা, মত রক্ষার জন্য যে দলাদলী বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, সাধারণত ব্রাহ্মগৃহে প্রেমের সাধন কিছু কম। ভগবানের প্রতি গভীর আস্থা না থাকিলে, রক্ত-মাংস-সংশ্রব-রহিত ভাই ভগিনীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা যায় না। সুতরাং সম্বন্ধ চিরকাল অটুট থাকে না।

ব্রাহ্ম পতি পত্নীর লক্ষ্য যে আধুনিক হিন্দুসমাজ হইতে কিছু স্বতন্ত্র, একথাটী বুঝাইবার জন্য সমাজ বিশেষ কোন চেষ্টা করিতেছেন না। পরিণীত হইবার সময় হিন্দু সমাজের বালক বালিকারা আপনাদের দায়িত্ব বুঝিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের নিকট কিছুই আশা করা যায় না। যাঁহারা দায়িত্ব বুঝিয়া পরিণীত হন, তাঁহাদের লক্ষ্য কাজেই কিছু স্বতন্ত্র। দায়িত্ব-বোধ জন্মাইবার সময়ে, জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনের দায়িত্ব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া সমাজের পক্ষে একান্ত উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মসমাজ এই দীর্ঘকালের মধ্যে সে সম্বন্ধে চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। অন্ততঃ আমরা যে আদর্শ চাই, তাহার অনুরূপ করেন নাই। করিলে, এই যে দলাদলী, এই যে ভালবাসার দুর্ভিক্ষ, এ সকল থাকিত না;—ব্রাহ্ম পতি পত্নীর দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হইত, ব্রাহ্মসমাজ একটা প্রেমের সমাজ হইত;—মত লইয়া মারামারি, কাটাকাটী, ছুটাছুটীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইত। ব্রাহ্মসমাজ ক্রমাগত স্বাতন্ত্র্যের দিকে চলিয়াছে। একতা বা মিলন, সুদূর-পরাহত হইয়া পড়িতেছে। দলের পর ক্রমাগতই দল বৃদ্ধি পাইতেছে। মূল কাটিয়া মস্তকে জলসেচন করিলে কখনই সুফলের আশা করা যায় না। অনেক স্থলে ব্রাহ্মবিবাহ হইতেই যেন স্বাতন্ত্র্যের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে। ইহা বড়ই দুঃখের কথা। উঠিতে বসিতে, শুইতে যাইতে, আহারে বিহারে, গৃহে বাহিরে—সুখে দুঃখে পতি পত্নী একাত্মক। একই লক্ষ্য, একই উদ্দেশ্য—পতি পত্নীর হইবে। দুই মিলিয়া দেশের সহস্র জনকে মিলাইবে,—সহস্র জনের অশ্রু ঘুচাইবে। এই আদর্শ আধুনিক বিবাহে সাধিত হইতেছে না। বাল্য বিবাহে তাহা সাধিত হইতেই পারে না। যৌবন বিবাহেই এক মাত্র তাহা সাধিত

হইবার আশা আছে। কিন্তু নিজ সুখ ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু যদি বিবাহের লক্ষ্য না হয়, তবে যৌবন বিবাহেও তাহা সাধিত হইবার নয়।

একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা, প্রেম সাধনার একটী উৎকৃষ্ট উপায়। যৌবন-বিবাহ ধর্ম্মমূলক হইলে, এই প্রথার মূলে কখনই কুঠারাঘাত পড়িতে পারে না। রক্তমাংসের সম্বন্ধের অপেক্ষা, ধর্ম্ম-বন্ধন, মিলনের অধিক উপযোগী। এক ধর্ম্মে দীক্ষিত—এক পিতা মাতা লক্ষ্য—একের চরণে সকলের মস্তক; সুতরাং এখানে প্রেম সাধনের এক বিস্তৃত ক্ষেত্র। কিন্তু স্থানে স্থানে এই ধর্ম্ম-সম্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষিত না হওয়ায়, এই প্রথার প্রতি কেহ কেহ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন। স্থানে স্থানে এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনও চলিতেছে। কিন্তু কুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই এরূপ একটী সুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত করা উচিত নয়। অগ্নিতে বার বার গৃহ দাহ হইতে পারে, তবুও অগ্নির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার্য্য নয়। একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিরুদ্ধে সহস্র আপত্তি থাকিলেও প্রেম শিক্ষার পক্ষে এটী যে একটী সুপ্রণালী, ইহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং এই প্রণালীটীকে ব্রাহ্ম-সমাজের সযত্নে রক্ষা করা উচিত। পরস্পরের জন্য ভাবিতে ও খাটিতে শিখিলেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের সম্ভাবনা—বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিলে নয়।

আমরা বলিয়াছি, জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম, এই তিনের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রাহ্মসমাজ আশানুরূপ চেষ্টা করিতেছেন না। বিবাহের পূর্ব্বে এটীকে বর কন্যার মনে অঙ্কিত করিতে না পারার দরুণ, আশানুরূপ সুফল প্রসূত হইতেছে না, ইহাও বলিয়াছি! কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে,—জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম, এই তিনের সমঞ্জসীভূত উন্নতি সাধনের জন্য বর্ত্তমান সময়ে যা কিছু চেষ্টা, ব্রাহ্মসমাজই করিতেছেন। এই তিনের আংশিক উন্নতি সাধনে কৃতকার্য্য হওয়াতেই ব্রাহ্মসমাজ দেশের মধ্যে একটা মহাশক্তির ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয় ভাষার উন্নতি বল, সমাজ সংস্কার বল, রাজনীতির আন্দোলন বল, এ সকলের মূলে স্বতঃপরত এই ব্রাহ্মসমাজের শক্তি কার্য্য করিতেছে। ইহাও কিছুই নয়। ব্রাহ্মসমাজের যে মহাশক্তির কথা বলিতেছিলাম—তাহা চরিত্রগত মহত্ত্ব। কতক পরিমাণে, নীতিতে ও ধর্ম্মেতে ভূষিত হইয়াই ব্রাহ্মসমাজ দেশের মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য্য শক্তি বিকীর্ণ করিতেছেন। কতক পরিমাণে দেশের দূষিত দুর্নীতির বায়ুকে পরিশুদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ দেশের মহা কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। কিন্তু

প্রশংসার দিকে মন না দিয়া, দোষের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত বলিয়া আমরা তাহাই করিয়াছি। অপরাধ হইয়া থাকে, যে শাস্তি ইচ্ছা, দেও।

ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মকে বিবাহের ভিত্তি করিয়া রাখেন নাই বলিয়া দেশের অপকার হইয়াছে, আমরা বলিয়াছি। ব্রাহ্ম সমাজের এ বিষয়ে দোষ থাকিলেও, এই সমাজভুক্ত অনেক সাধু ব্যক্তি সে দোষে দোষী নন। আমরা জানি, অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একমাত্র আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিবাহিত হইয়াছেন। তাঁহাদের বিবাহ, যৌবনবিবাহের অমৃতময় ফল প্রসব করিয়াছে। সে সকল চিত্র দেখিলে প্রাণ আশাতে প্রদীপ্ত হয়—দেশের ভাবী উন্নতি নিকটবর্ত্তী হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বেচ্ছাচারিতা সমাজ-বন্ধনের বিরোধী কেন?

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের শেষে বলিয়াছি যে, একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা, প্রেম সাধনের একটী উৎকৃষ্ট উপায়। নানা কারণে এই প্রথার প্রতি লোক কিছু বিরক্ত। সুতরাং প্রেম-সাধনায় কিছু ব্যাঘাত ঘটিতেছে। প্রেম-সাধনা ভিন্ন ধর্ম্মলাভ অসম্ভব। প্রেমের পথে নানা কারণে কণ্টক পড়াতে ব্রাহ্ম পতি পত্নী কিছু ধর্ম্মলক্ষ্যভ্রষ্ট, সুতরাং সংসারাসক্ত হইয়া পড়িতেছেন। এই ধর্ম্মহীনতার আরো যে সকল কারণ আছে, সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। বিধাতা আমাদিগকে সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মহীনতার হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে স্বাধীনতার নামে অল্পে অল্পে কিছু স্বেচ্ছাচারিতা প্রবেশ করিয়াছে। সকলেই স্ব স্ব প্রধান, পরস্পরের প্রতি বড় একটা শ্রদ্ধা বা ভক্তির ভাব নাই। স্বাধীনতা-পক্ষপাতী ব্যক্তি অন্যের স্বাধীনতার সম্মান রাখিতে পারিতেছেন না! মতে মত না মিলিলে, পরস্পরকে অপদস্থ করিতে ব্রাহ্মেরা বড়ই মজবুত। অনেকদিন পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মসমাজে প্রতিবাদ করার শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে। অধিক বয়স্ক ব্যক্তির প্রতি, অভিজ্ঞতার প্রতি সম্মান রাখিতে হইবে,—এ শিক্ষাটী বড়ই কম। মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ হইতে ভক্ত কেশবচন্দ্র, এবং কেশবচন্দ্র হইতে নব্য ব্রাহ্মদল—সকলেই স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার ধূয়া ধরিয়া পরস্পরের মতকে উপেক্ষা করিতে শিক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন। মতের প্রতিবাদের শিক্ষাটা বড়ই প্রবল। কিন্তু মত পালনে দৃষ্টি বড় কম। সেই শিক্ষার কুফলে আজ ব্রাহ্ম-সমাজ দারুণ অপ্রেমের লীলাস্থল হইয়া উঠিয়াছে। পরস্পরের মতের প্রতি উপেক্ষা করা, ঘৃণা প্রদর্শন করা বা পরস্পরকে নিন্দা করা অধিকাংশ ব্রাহ্মের দৈনিক কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কি উপাসনামন্দির, কি প্রচারক্ষেত্র, কি সভাগৃহ, কি পরিবারের কেন্দ্র, সর্ব্বত্রই অবাধে সকলে পরস্পরের নিন্দা করিতেছেন! এই কদর্য্য শিক্ষায় দীক্ষিত—বালক বালিকা, যুবক বৃদ্ধ, অনেকেই। আজ যে ভেক লইয়া সংসার ছাড়িয়া বৈরাগী সাজিয়াছে, সেও বক্রমুখে প্রবীণের নিন্দা করে; কাল যে ব্যভিচার ও মদ্যপান পরিহার করিয়া ভক্তবেশ ধরিয়াছে, সেও অবাধে নানা মতের প্রতি উপেক্ষা করিতেছে। কেশবচন্দ্র সেনকে সাধারণ সমাজের অধিকাংশ লোক ঘৃণার চক্ষে দেখেন, নববিধান সমাজ সাধারণ-তন্ত্রভুক্ত ব্রাহ্ম-অধিনায়কগণের প্রতি ঘৃণার কটাক্ষপাত করেন। এই ঘৃণা, এই নিন্দার স্রোত—উপর হইতে আরম্ভ করিয়া এখন নিম্নস্তর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। ছোট ছোট বালক বালিকা, অপেক্ষাকৃত বড় বড় যুবক যুবতী, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব যাহারা মোটেই বুঝে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তাহারাও আজ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বক্রমুখে প্রবীণদিগের কত নিন্দা প্রচার করিতেছে! আজ কালকার দিনে, প্রেম-শিক্ষার পরিবর্ত্তে ঘৃণা বিদ্বেষ বা স্বাতন্ত্র্য-শিক্ষাই প্রধান শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে! "যত ছিল নাড়াবুনে, সব হলো কীর্ত্তুনে"—আমাদের দেশের একটী প্রাচীন কথা। ব্রাহ্মসমাজের নব্যদল সম্বন্ধেও এই কথা খুব খাটে। ব্রাহ্মসমাজের কে বড় কে ছোট, কার মত প্রবল, কার মত অপ্রবল, ইহা নির্ণয় ক'রা আজ কাল বড়ই কঠিন। কার কথা কে শুনিবে, কার কথা কে মানিবে? সকলেই স্ব স্ব প্রধান। হাজার লোকের হাজার মত। কাহারও মতে কেহ চলিবে না। কারণ, এ যে স্বাধীনতার যুগ! বিবাহের আদর্শ তোমার একরূপ, আমার অন্যরূপ; তোমার কথা আমি মানিব কেন? তুমি বিবাহের পূর্ব্বে যে সকল আচার ব্যবহার নিষেধ কর, আমি তাহাকেই উচিত মনে করি! একটী বালিকা একটী যুবককে দাদা বা কাকা বলিয়া ডাকিয়াছিল, তারপর বিবাহ করি-

য়াছে, তাতে দোষ কি (১)? তোমার মতে দোষ, আমার মতে দোষ নয়। বিবাহের পূর্ব্বে স্বেচ্ছা-বিহার তোমার মতে অবৈধ হইতে পারে, আমি ইহাকে প্রণয়-প্রস্ফোটনের পক্ষে পরম সহায় বলিয়া মনে করি! সুতরাং তোমার সঙ্কীর্ণ মতামতে আমি চলিব কেন?—আজকালকার অনেক নব্য-ব্রাহ্মের মুখে মুখে এই কথা। প্রবীণ লোকের মুখের উপর ধা করিয়া কত যুবক আজ কাল কত অসম্মান-সূচক কথা বলে। স্বাধীন যুগের স্বাধীনতার স্রোত এমনই প্রবল বেগে চলিয়াছে যে,—কোন কথা বলিতে বা লিখিতে ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইতে হয়! কথা যে কেহ মানিবে, সে আশা অতি কম। এইরূপে প্রবীণ লোকদের আদর্শচিত্র উপেক্ষিত হইতেছে ও আদর্শ মত ঘৃণার সহিত পরিত্যক্ত হইতেছে। এই যে স্রোত, এই স্রোতের গতি যে কোথায় যাইয়া থামিবে, আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বিবাহের পূর্ব্বে কোন অবৈধ ঘটনার প্রতিবাদ করিয়া নিস্তার পাওয়া এখন আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়। প্রবীণ ব্রাহ্মগণ এ বিষয় বুঝিতে পারিতেছেন না, তাহা আমরা মনে করি না, কিন্তু তাঁহারা হতজ্ঞান হইয়া এই স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতেছেন। শোচনীয় অবস্থার কথা কে ভাবিবে? তুমি বলিতে চাও, তোমার দুর্দ্দশার একশেষ হইবে। বাদ প্রতিবাদ, মত লইয়া মারামারী, কাটাকাটী করিতেই অধিক সময় চলিয়া যাইতেছে, কে বল আর সাধন ভজনে মন দেয়। প্রতিবাদ-স্রোতের প্রাবল্যে, সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ যে দিন দিন ধর্ম্মহীন হইবে, কিছুই আশ্চর্য্যের নয়। তার উপর আবার বিলাসিতা ও সংসারাসক্তির দারুণ পরাক্রম। মতসর্ব্বস্ব-সাধনায় ব্রাহ্মসমাজ দিন দিন যে কি শোচনীয় অবস্থায় যাইয়া উপস্থিত হইতেছে, কল্পনা করিতেও কষ্ট হয়। বিধাতা এই সমাজকে পাপের ভয়ানক আধিপত্য হইতে রক্ষা করুন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্রাহ্ম কোন শাস্ত্র মানেন না, সমাজ সম্বন্ধেও কোন শাস্ত্র বা নিয়ম মানেন না। সমাজ চিরকাল পরিবর্ত্তনশীল। এক নিয়ম, সুতরাং চিরকাল খাটে না। নিয়মহীন সমাজ, একবার জাগে, আবার ডুবে। উন্নতির পরিবর্ত্তে তাই অবনতি, নিয়মহীন সমাজের ভাগ্যে প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে।

(১) এই মতটী ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ বিভাগে এত প্রচলিত হইয়াছে যে, প্রকাশ্য পত্রিকায় যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক, এ সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার একজন সভ্য ইহার পোষকতা করিয়াছেন। নব্যভারত চর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় তৃতীয় সংখ্যা, ১২৭ পৃষ্ঠা দেখ।

আবার উন্নতি হইবে না, তা বলিনা। কিন্তু সে বড় দূরের কথা। সকল শাস্ত্র, সকল নিয়ম উপেক্ষা করিতে শিক্ষা দিয়া নবীন ব্রাহ্মদিগকে স্বেচ্ছাচারের পথে যাইতে আদেশ করিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহারা এই কঠিন সঙ্কটাপন্ন সমস্যার দিনে কি ভাবিতেছেন, আমরা জানি না। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, এ যুগের সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রণালী যদি স্থির করিতে এবং ব্যবহারিক জীবনে তাহা চালাইতে ব্রাহ্মসমাজ অকৃতকার্য্য বা অমনোযোগী হন, তবে এই উচ্ছৃঙ্খল সমাজ রক্ষার আর উপায় নাই। আগুন লইয়া খেলা সামান্য ব্যাপার নয়। দিন দিন ব্রাহ্মসমাজ একটি সমাজের আকার ধারণ করিতেছে। এখন নিয়মাদি ভিন্ন, সতর্কতা ভিন্ন চলা দুষ্কর। সমাজের আবশ্যকতা মানিতে গেলে নিয়মের আবশ্যকতাও অবশ্যই মানিতে হইবে। কিন্তু সেই নিয়মের মূলে প্রেম, ভগবদ্ভক্তি ও গভীর সাধন ভজনের অঙ্কুর থাকা চাই। কেবল লোককে শাসন করিবার জন্য যে নিয়ম, তাহাতে মঙ্গলের আশা বড়ই অল্প।

ব্রাহ্মসমাজ এ পর্য্যন্ত বিবেকের প্রাধান্য ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন। বিবেক না মানিলে, ধর্ম্মকে দাঁড় করান কিছু কঠিন। ভগবান মানুষের নিকট স্পষ্ট কথা বলেন, এ কথা না মানিলে ধর্ম্মকে দাঁড় করান যায় না। কাজেই কতকটা অভ্রান্তবাদ মানিতেই হয়। মানুষের নিকট ভগবান যে কথা বলেন, তাহা অভ্রান্ত। কিন্তু গভীর সাধন ভজন ভিন্ন, বিবেকের কথা বা আদেশ বুঝিতে পারা বড়ই কঠিন। কঠিন বলিয়াই, হিন্দুশাস্ত্রকারেরা গুরুর উপদেশ মান্য করিতে বলিয়াছেন। সেই উপদেশ, আবার অধিকারী ভেদে, নানা সময়ে, নানা রূপ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে গুরুর উপদেশের প্রতি আস্থা নাই, কারণ এ সমাজের শিক্ষাই সেরূপ নয়। এখানে বাধ্য হইয়া বৃদ্ধ এবং বালককে, জ্ঞানী এবং মূর্খকে ঐ বিবেকের কথার দিকেই চাহিয়া থাকিতে হয়।' কিন্তু এ দিকে সাধন ভজন বড় কম। তাই ভুল ভ্রান্তি যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। আজ যে পথে, কাল তার ঠিক বিপরীত পথে অথবা কাল যে পথে যাইবে আজ তার ঠিক ভিন্ন পথে চলিতে হয়। ধর্ম্মের দৃঢ়তা, অটল বিশ্বাস সাধারণত মানুষের বড়ই কম। আজ এটা, কাল সেটা, কাজেই মানুষকে ভুলাইতে থাকে। গভীর ধর্ম্মসাধনার অভাবে বুদ্ধি ও ধারণাশক্তির তারতম্যানুসারে মানুষের বিবেক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কথা বলে। আজ যেমন কাল তেমন নয়, রামের

যেমন শ্যামের তেমন নয়। ব্যক্তিগত স্বেচ্ছা বা খেয়াল, আসক্তি বা সুখ-ইচ্ছা অনেক সময়ে বিবেকের স্থানীয় হইয়া মানুষকে নানারূপ বিপথে লইয়া যাইতেছে। বিশ্বাসের স্থিরতা কিছুতেই জন্মিতেছে না। আজ এটা, কাল সেটা। বিবেক কি মানুষকে কখনও এইরূপ চঞ্চল করে? না, তা নয়। বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধি চিরকাল মানুষকে একই পথে লইয়া যায়। ধর্ম্ম-বুদ্ধির স্থানীয় হইয়া, অনেক সময়, সংসারবুদ্ধি মানুষকে পথ ভুলাইয়া ফেলে। তাই মানুষের এত চঞ্চলতা দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মের স্থানে অধর্ম্ম, স্বর্গের স্থানে সংসার, বৈরাগ্যের স্থানে আসক্তি, প্রেমের স্থানে ঘৃণা বিদ্বেষ,—তাই মানুষের হৃদয়ে স্থান লইয়া জীবনকে মলিন ও কলুষিত করে। সংসারাসক্তি বা স্বেচ্ছার কথা ও বিবেকের কথায় তারতম্য করা বড়ই কঠিন। তাই ব্রাহ্মসমাজের এত মলিনতার অবস্থা উপস্থিত। আদর্শ মত ধরিতে না পাইয়া সকলেই হতবুদ্ধি। সমাজ কোন আদর্শমত ধার্য্য করেন নাই, সুতরাং সকলেই স্ব স্ব প্রধান। এই অবস্থায় ধর্ম্ম এবং নীতি অনাদৃত হইবে না কিরূপে? কিন্তু ইহার কি কোন ঔষধ নাই? এই ভয়ানক দুর্গতি হইতে রক্ষা পাইবার কি আর উপায় নাই? আছে। উপায়,—অবিশ্রান্ত প্রার্থনা, কঠোর তপস্যা, কঠোর নিবৃত্তি-সাধন। কিন্তু কে বল, সংসারখেলা ছাড়িয়া দিবারাত্রি তোমার প্রার্থনা, তপস্যা বা নিবৃত্তি-সাধন লইয়া, এই জড়বাদের দিনে বসিয়া থাকিবে? দুর্দ্দশা বা দুর্দ্দিন কেমনে ঘুচিবে, তা বল?

এ সকল কথা আমরা লিখিতেছি কেন? আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, ভগবানের বিধান না বুঝিয়া যাঁহারা বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন, দাম্পত্য-প্রেমের স্বর্গীয় পবিত্র কুসুম তাঁহাদের হৃদয়ে ফুটে না। এই বিধান বুঝি-বার সময় যে ভুল হইতে পারে, এ স্থলে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া একান্ত উচিত বলিয়া তাহা করিলাম। বিধান বুঝা বড়ই কঠিন। বিধানের স্রোতে না পড়ার দরুণ হিন্দু পতি পত্নীর অনেক স্থলে যে দুর্দ্দশা, ভুল-বিধান বুঝাতে ব্রাহ্মপতি পত্নীরও সেইরূপ দুর্দ্দশা। না বুঝিয়া বা বুঝিতে ভুল করিয়া, অনেক সময়, অযথা স্থানে অনেকে পরিণীত হইতেছেন। রূপজ-মোহ বা যৌবন-চাঞ্চল্য এবং সংসারাসক্তি বিবেকের স্থানীয় হইয়া মানুষকে ঘোরতর অন্ধকার, দুর্নীতি ও দুর্গতির পথে লইয়া যাইতেছে। সে ভীষণ পথ নরক অপেক্ষাও দুর্গতিময়। সেখানে যাইয়া মানুষ হাহাকার করিয়া

মরিতেছে। কিন্তু সে দুর্গতিময় পথের কথা মানুষ প্রথমে কিছুতেই বুঝিতে পারে না, বুঝিতে চায় না। নিজেও বুঝিবে না, অন্যের কথাও শুনিবে না। শাস্ত্রের কথাও মানিবে না, প্রাচীন অভিভাবকের পরামর্শেও কর্ণপাত করিবে না। আলোক দেখিয়া পতঙ্গ যেমন পুড়িয়া মরে, অনেকে সেই-রূপ সংসারের দারুণ যৌবনাগুনে জীবনাহুতি দিতেছেন। এই জন্যই আমরা বর কন্যার মনোনয়নের ভার, কেবল বর কন্যার উপর না রাখিয়া, বিজ্ঞ এবং স্বার্থশূন্য অভিভাবকদিগের উপরও কতক রাখিতে চাই। কিন্তু সে সকল কথা এ স্বাধীনতার দিনে লোকে শুনিবে কেন?

আমরা দেখিতেছি, ধর্ম্মপথের যে দুটী পরিষ্কার পথ, স্বাধীনতা ও বিবেক-প্রাধান্য, সেই প্রধান দুটী অবলম্বনই বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের ভয়ানক অনিষ্ট করিতেছে। স্বাধীনতা এবং বিবেকের ধূয়া ধরিয়া লোক দিন দিন দুর্গতির পথে যাইতেছে। যে রক্ষক সে ভক্ষক হইলে, আর কে রাখিবে? ব্রাহ্মসমাজের রক্ষক আজ কাল ভক্ষক বেশ ধারণ করিয়াছে। এ দুর্দ্দিনের উপায় কি?—তা বিধাতাই জানেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিলাসিতা, বিবাহের সম্বন্ধ ও মনোনয়ন প্রথা।

স্বেচ্ছাচারিতা, ধর্ম্মহীনতার একটী প্রধান কারণ। ভগবানের বিধান না বুঝিতে পারায়, এবং স্বেচ্ছা বা সংসারাসক্তির প্রবল উত্তেজনায়, মানুষ যথাস্থানে পরিণীত হইতেছেন না, বলিয়াছি। বিলাসিতা ধর্ম্মহীনতার আর একটী কারণ, তাহাও ইঙ্গিতে বলিয়াছি। বাস্তবিক বিলাসিতা বর কন্যা মনোনয়নের পথে এক কঠিন অর্গল দিয়া রাখিতেছে। বাহ্য বেশভূষার আচ্ছাদনে শরীর ঢাকিয়া, মানুষ যাহা নয়, তাহাই জগতে দেখাইতেছে। এ সকল কথা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিখিয়া মনোনয়ন-প্রথা সম্বন্ধে অন্যান্য কথা লিখিব।

নানা কারণে লোকের মন সংসারের প্রতিই অধিক অনুরক্ত। সংসারটা প্রত্যক্ষ, স্বর্গটা কিছু অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ। সংসারের নানা সুখ-কামনায় মানুষ দিবানিশি ব্যতিব্যস্ত। সংসার ধরিয়া স্বর্গে উঠা যায়, এ গণনা করিয়া অতি

অল্প লোক চলে। স্বর্গ বা ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ হইয়া, কেবল সংসারের জন্য সংসার-সেবা করে—অধিকাংশ মানুষ। টাকা কড়ি, যশ মান, রূপ রস, এই সকল দিকেই মানুষের ঝোঁক অধিক। মনে ধর্ম্ম, বাহিরে সংসার-চিন্তা রাখিলেই মানুষের কল্যাণ হয়। কিন্তু এখন দেখা যায়, সংসার মনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, বাহিরে ধর্ম্মের কেবল কয়েকটা বাহ্য অনুষ্ঠান আছে। আসক্তি-বন্ধন মানুষের হাড়ে হাড়ে। ভাল খাইব, ভাল পরিব, ভাল থাকিব—এ চিন্তা অতি শৈশব হইতে মানুষকে ধরে। চরিত্রবান হইব, বিশ্বাসী হইব, ভক্ত হইব—এ সকল চিন্তা অতি অল্প লোকের মধ্যে নিবদ্ধ। দেশের প্রবীণ লোকদিগের প্রদত্ত শিক্ষাও সেরূপ নয়। পিতা, মাতা, সন্তানের বাল্যকাল হইতেই, বেশ ভূষার প্রতি অধিক মনোযোগী হইয়া পড়েন। বিদ্যা শিক্ষার জন্যও কেহ কেহ মনোযোগ করেন বটে, কিন্তু বালক বালিকার নীতি শিক্ষার প্রতি শতকরা একজন অভিভাবক মনোযোগী কিনা, সন্দেহ। সংসার সাধনের জন্য, সংসারের শিক্ষা, অর্থকরী বিদ্যা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু সে শিক্ষা মানুষের পরিণাম নয়। স্বর্গই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। স্বর্গের শিক্ষা, ভগবৎপ্রেম ও নীতি শিক্ষা সহস্র গুণে অধিক প্রয়োজনীয়। কিন্তু কি এক দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছে, এ দিকে দৃষ্টি অতি কম। এই একমাত্র লক্ষ্যের প্রতি মানুষ যেরূপ উদাসীন, এরূপ কিন্তু সংসার সম্বন্ধে নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধী লাভের সহিত কত যুবক যে অহঙ্কারী, আত্মাভিমানী হইয়া সংসারে ফিরিতেছেন, কে না জানেন? কলেজে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও কত যুবক যে আজ কাল নীতি ও চরিত্র-হীন হইয়া সাংসারিকতার দাস হইয়া পড়িতেছেন, তাহাই বা কে না জানেন? এই সকল চরিত্রহীন শিক্ষিত যুবকবৃন্দের উত্তেজনায়, ছলনায় ও আদর্শে দেশে যে কি শোচনীয় চরিত্রহীনতার ছবি ফুটিতেছে, তাহা কল্পনা করিলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। পমেটম্, লেবেণ্ডার, হউডিকলং, আতর, ও গোলাপ রঞ্জিত ফুরফুরে ধুতি পরিধায়ী, চেন্ ঘড়ি শোভিত, অহঙ্কারস্ফীত শিক্ষিত ব্যক্তিগণের কথা দূরে থাকুক। তাহাদের নিকট দেশ অনেক আশা করিয়া থাকিলেও, সে আশায় অনেক দিন ছাই পড়িয়াছে। তাঁহারা সংসারের কীট হইতে বসিয়াছেন, তাহাই হউন। পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের উজ্জ্বল ছবি সাংসারিকতার ঘোরতর বিলাসের ইন্ধনে ধূমময় হইয়া উঠিবে, কে স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিয়াছিল? অবশ্য একথা স্বীকার্য্য, কতিপয়

সাধু ভক্ত সন্তান সমাজের এই প্রবল বিলাসের স্রোত ফিরাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টায় যে সুফল ফলিতেছে,তাহা মনে করিতে পারিতেছি না। দিন দিনই বেশ ভূষার দিকে অনেকের ঝোঁক পড়িতেছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশীয় মহিলাদের অলঙ্কারের প্রতি অধিক ঝোঁক ছিল। গহনার উত্তেজনায়, এদেশের কত পত্নী দেবতা সদৃশ স্বামীকে চরণে ঠেলিয়া খেয়ালের সেবা করিয়াছেন, সংখ্যা করা যায় না। ব্রাহ্ম-সমাজে সেরূপ দৃশ্য ঘটে নাই। কিন্তু ব্রাহ্ম বালক বালিকার মধ্যে যে পরিচ্ছদাদির প্রতি একটা ভয়ানক আসক্তি বাড়িয়া উঠিতেছে, একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। বিলাসের দিকে যখন মানুষের আন্তরিক ঝোঁক পড়ে, তখন যে ধর্ম্মে বড় একটা মতি থাকে না, এ কথায় সন্দেহ বড় কম। মানুষের যখন বাহ্য বিষয়ে দৃষ্টি পড়ে, তখন অন্তরদৃষ্টি বা ধর্ম্ম-জ্ঞান হ্রাস হয়। আজ কাল নানাপ্রকার নূতন নূতন প্রণালীতে এই বেশ ভূষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। একটা অতি সামান্য রকমের জ্যাকেট বা কোট প্রস্তুতে ৭।৮ টাকা লাগে। কোন কোন স্থলে ১০, টাকা পর্য্যন্ত লাগে কত প্রকারেই বাহ্য শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। ইহার সহিত ধর্ম্মে মতি গতিও অনেক কমিয়া যাইতেছে। এ দোষ কাহার? আমাদের মতে এ দোষ—উপদেষ্টা এবং অভিভাবকদিগেরই অধিক। হিন্দু অভিভাবকেরা যেমন স্কুলে বিদ্যা শিক্ষার জন্য বালক-দিগকে পাঠাইয়াই অনেক স্থলে সন্তুষ্ট থাকেন, নীতি শিক্ষা যে তাদের একটা লক্ষ্য, কুকার্য্যে যোগ দেওয়া যে ভয়ানক গর্হিত কার্য্য, এ সকল বিষয়ে যেমন বিশেষ কোন শিক্ষা দেন না, ব্রাহ্ম উপদেষ্টা বা ব্রাহ্ম অভি-ভাবকগণও, সমাজে যাতায়াতের পথ খুলিয়া দিয়া, সেইরূপ, অন্য বিষয় সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত। কেবল কি নিশ্চিন্ত? না। তাঁহারাই প্রকা-রান্তরে বালক বালিকাদিগের বিলাসের "খেয়ালে ইন্ধন দিতেছেন—ধার কর্জ্জ করিয়াও পরিচ্ছদাদির বাহ্যচটক বৃদ্ধি করিতেছেন। ভিতরের দিকে দৃষ্টি পড়ুক, চরিত্র ভাল হউক, ধর্ম্মে মতি হউক, এ সকল ইচ্ছা, প্রকারা-ন্তরে, যেন অভিভাবকদিগের মন হইতে বিদায় লইতেছে। কেন বলি-তেছি?—না হইলে—বালক বালিকাদিগের বেশ ভূষা লইয়া তাঁহারা যত ব্যস্ত, চরিত্রগঠনে তদপেক্ষা অধিক ব্যস্ত হইতেন। আমরা অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মের মুখে আক্ষেপ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি, "গরীব লোকের ব্রাহ্ম

হওয়া বড়ই দায় হইয়া উঠিল। নবাবের মত জাঁকজমকের জন্য এত টাকা কোথায় পাইব?" আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এক সময়ে যাঁহারা আক্ষেপ করেন, তাঁহারাও অবশেষে দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, ধার কর্জ্জ করিয়া, বালক বালিকাকে নানা সাজসজ্জায় সাজাইয়া তোলেন। এ সকল বিলাস সেবার উপকরণ বৃদ্ধি করা অন্যায় কি ন্যায়, সে বিষয়ে মতভেদ থাকা সম্ভব। সভ্যতা রক্ষার জন্য পরিচ্ছদ ইত্যাদির উৎকৃষ্টতা সাধন প্রয়োজনীয় কি না, সে গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চাই না। আমরা এইমাত্র বলি, বিদ্যাসাগর মহাশয় বেশ ভূষার ধূম ধাম না করিয়াও চরিত্র-প্রাধান্যে সর্ব্বপূজ্য। আমরা এইমাত্র বলি, যার অবস্থায় কুলায় না, তার এ সম্বন্ধে অধিক অগ্রসর হওয়া ভাল নয়। আমরা এইমাত্র বলি, ধর্ম্ম-সমাজের পক্ষে এ সকল বাহ্য-বিষয়ে অধিক মনোযোগ দেওয়া ভাল নয়। এই সকল দিকে মন যত কম থাকে, ততই ভাল। চরিত্রগঠন ধর্ম্ম-সমাজের প্রধান লক্ষ্য। চরিত্র গঠিত হইলে আর চাই কি?—বাহ্য পোষাক পরিচ্ছদের জাঁকজমক ইত্যাদি কিছুই চাই না। ভিতরে যে দেবত্ব ও ঋষিত্ব পাইয়াছে, বাহিরে তার মলিন পোষাক থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। ধর্ম্ম-সমাজে, জীর্ণ শীর্ণ মলিন বস্ত্রপরিধায়ী হইলেও চরিত্রবান ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর পাওয়া উচিত। আর চরিত্রহীন হইলে, হাজার জাঁকাল বেশ ভূষায় শোভিত হইলেও, লোকের নিকট আদর পাওয়া উচিত নয়। কিন্তু দেখা গিয়াছে, অনেক স্থলে তাহা হয় না। একজন চরিত্রহীন লোক খুব জাঁকজমক করিয়া বাড়ীতে আসুন, দেখিবে, অনেক স্থলে সে ব্যক্তি ঐ ছিন্নবস্ত্র-পরিধায়ী চরিত্রবান লোকাপেক্ষা অধিক আদর সম্ভাষণ পাইবে। কেবল হিন্দু সমাজের কথা বলিতেছি না। ব্রাহ্মসমাজও কতকটা ধন-গৌরব, পদ-গৌরব ও পোষাক-গৌরব ইত্যাদির অধিক আদর করিতেছেন, কিন্তু, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কে জানে, চরিত্রবান ও ধার্ম্মিককে অবহেলা করিতেছেন। এই কুদৃষ্টান্ত দেখিয়া বালক বালিকারা কত কুশিক্ষা পাইতেছে! কিন্তু তবুও বাহ্যাড়ম্বরের সাজসজ্জা অপ্রতিহত প্রভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বাহ্য বস্তু সকলের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ পড়ায়, বালক বালিকারা অন্তঃসার-শূন্য হইয়া, দিন দিন ভয়ানক বিলাসের দাস দাসী হইয়া পড়িতেছে। খোলার ঘরে বসিয়া অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে এখনকার শিক্ষিতা বালিকারা কত বিরক্ত! বাজার হইতে মৎস্য তরকারী প্রভৃতি ক্রয় করিয়া

আনিতে এখনকার বালকেরা কত লজ্জা বোধ করে। কথায় কথায় মান বাড়ে, কথায় কথায় মান যায়। মান সম্ভ্রম পাইবার জন্য প্রাণের একটা গভীর লালসা। বাহ্য শোভা সৌন্দর্য্য, গৌরব আস্ফালন, এখনকার সময়ের লোকের একটা প্রধান আদরের সামগ্রী। বরকন্যার মনোনয়নের সময় এই বাহ্য বিলাসপ্রিয়তা যে কত স্ফূর্ত্তি পায়, তাহা সংক্ষেপে বলা যায় না। চরিত্রের বলে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা অপেক্ষা, শোভা সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতেই যেন বর কন্যা অধিক মনোযোগী। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংসারটা প্রত্যক্ষ, স্বর্গটা অপ্রত্যক্ষ, অতি দূরের, সুতরাং এই সংসারের বাহ্য সম্পদ বিভব যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর পাইবে, তাতে আশ্চর্য্য কি? বাস্তবিক, খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, ইহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, মনোনয়ন-প্রথায় ঢাকাঢাকি চাপাচাপি ভাব বাহ্য সৌন্দর্য্যের তাড়নায় অধিক স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। বিবাহের প্রস্তাবের পর যে দেখা সাক্ষাৎ হয়, তাতে বর কন্যার ভিতরের হৃদয়গত সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব বড় একটা অধিক জানা যায় না, কারণ উভয়েই তখন কিছু সতর্ক হন। উভয় যদি উভয়কে ঠকাইতে প্রস্তুত হন, তবে মিষ্ট আলাপে, মিষ্ট হাসিতে পরস্পর যে পরস্পরকে অল্পেই ভুলাইয়া ফেলিতে পারেন, তাতেই বা বিচিত্র কি? বস্তুত অনেক স্থলে ইহা হওয়াই সম্ভব এবং এইরূপই হয়। অনেক সময়, বাহ্য সৌন্দর্য্যের চাকচিক্যে যে অনেকে ভুলেন, তাতে বড় ভুল নাই। অনেক সময় দেখা যায়, বাহ্য শোভার জন্যই বর কন্যা অধিক লালায়িত। অন্তরের গুণ না জানিয়া কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যে মজিলে, মিলন কিছুতেই গাঢ় হইতে পারে না। কারণ বাহ্য শোভা সৌন্দর্য্য অধিক দিন স্থায়ী থাকে না। অন্ততঃ কতক ভিতরের সৌন্দর্য্য জানিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। বাহ্য আকৃতিতে কতক ভিতর জানা যায় বটে, কিন্তু তাহাও অনেক স্থলে বেশ ভূষায় ও বাহ্য জাঁকজমকে চাপা থাকে। অভিভাবকগণ যদি এস্থলে চরিত্র সম্বন্ধে মতামত দিতে অনধিকারী হন, তবে এ স্থলে বর কন্যা যে পরস্পরকে চিনিতে ভুল করিবেন না, কেমনে বলিব? চারিত্র্য-মহত্ত্ব ও প্রকৃত ধর্ম্মভাব অল্প দিনের দেখা সাক্ষাতে বুঝা বড় কঠিন। তারপর পরস্পরকে ঠকাইতে যদি পরস্পরের ইচ্ছা থাকে, তবে বুঝা যে আরো কঠিন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্য ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বরকন্যা, মনোনয়ন অনুসারে বিবাহের পরও কতবার বিবাহ-ভঙ্গ করেন।

কত স্থানে বরকন্যা প্রতারিত হয়! মনে কর, বরকে ভুলাইতে কন্যা চেষ্টা করিলেন; কন্যাকে ভুলাইতে বর চেষ্টা করিলেন। উভয়ে উভয়ের হৃদয়জাত ভাবরাশিকে ঢাকিয়া রাখিয়া, বাহ্য শোভার আকর্ষণে উভয়ের মন পাইলেন। তারপর বিবাহ হইল। তারপর দুবৎসর বাদে উভয় উভয়কে প্রকৃতরূপ চিনিলেন। এমন কি, পূর্ব্বে যেরূপ পরস্পরকে বুঝিয়াছিলেন, মনে কর এখন তার ঠিক বিপরীত রূপ বুঝিলেন। এখন ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত—দারুণ অশান্তি উপস্থিত। বিবাহ-ভঙ্গ-প্রথা ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত নাই, এবং থাকাও যখন উচিত নয়, তখন ভাব, চিরকাল কত অশান্তি ভোগ করিতে হইবে! পরস্পরের মত যখন পরিবর্ত্তনশীল, তখন অন্য কারণেও ভবিষ্যতে অমিল হইতে পারে; কিন্তু সে কথা এখানে বিচার্য্য নয়। ভুল বুঝাতে যে দুর্ব্বিসহ কষ্ট হয়, সে কষ্টের সহিত অন্য কষ্টের তুলনা হয় না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, তাহারা নিজেরাই যখন পায়ে শৃঙ্খল দিয়াছে, তখন আর কে কি করিবে? দুষ্কার্য্যের ফলভোগ নিজেরাই করুক। আমাদের বিবেচনায়, এ কথাটী সঙ্গত নয়। আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের আবশ্যকতা পৃথিবীতে এই জন্যই যে, সকল বিষয়ে পরস্পরের সাহায্য পাওয়া যাইবে। এই সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া কেহই সুখ শান্তিতে থাকিতে পারে না। অন্যান্য সময়ে যেমন পরস্পরের সাহায্য প্রয়োজন, এই কঠিন ব্রত গ্রহণের সময়ও সেইরূপ প্রয়োজন। আমাদের বিবেচনায় এই জন্যও বর কন্যার মনোনয়নের ভার কতক অভিভাবকের উপর রাখা একান্ত উচিত। অভিভাবকেরা পূর্ব্বে সৎপাত্র বা কন্যা মনোনীত করিবেন। চরিত্রগত মহত্ত্বে এবং প্রকৃতিতে উভয়ের সহিত সামঞ্জস্য ও রোগাদি আছে কি না, এবং শিক্ষা ও বয়সের উপযুক্ততা প্রথম অভিভাবকেরা বিচার করিবেন। তারপর বর কন্যাকে দেখা সাক্ষাতের অধিকার দিয়া, ভগবানের বিধান প্রভৃতি বুঝিতে দিবেন। যাহাদের অভিভাবক নাই, তাহাদের পক্ষে, প্রতিপালক বা বন্ধু বান্ধবের মতামত মান্য করা উচিত। যদি বন্ধু ও প্রতিপালকের মতের সহিত বর কন্যার মত না মিলে, তবে সমাজের এই বিষয় হাত দিয়া মীমাংসা করা উচিত।

এ স্থলে আর একটি কথা। অভিভাবকদিগের এবং তদভাবে সমাজের প্রবীণ লোকদিগের অজ্ঞাতে বিবাহ সম্বন্ধে কোন প্রকার কথা বার্ত্তা চলিতে দেওয়া উচিত নয়। হঠাৎ যদি অনুরাগ হইয়া উঠে, তবে তাহাও সর্ব্বাগ্রে

অভিভাবককে জানান উচিত। অভিভাবকের যদি তাহাতে অমত থাকে, তবে তখনই তাহা প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করা উচিত। বহু দিন চেষ্টা করিয়াও যদি মনের গতিরোধ না হয়, তবে অগত্যা ২।৩ বৎসর পর, তাহাদের স্বভাবচরিত্রের কঠোর পরীক্ষা করিয়া, সমাজ বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলে দিতে পারেন। এই অপেক্ষার সময়ে, কয়েকজন লোকেরই অন্ততঃ বর কন্যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। গোপনে গোপনে অনুরাগ বৃদ্ধি পাইলে, বা বিবাহের প্রস্তাবের পর অনেক দিন অপেক্ষা করিলে ভিতরে যে কি গরল উৎপন্ন হয়, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে বলিয়া বোধ হয় না। এ সকল স্থানে দেবতারও ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়া সম্ভব। সামান্য মানুষের মনে যে গরল জন্মিবে, বিচিত্র কি ? সামাজিক নিয়মের কঠোরতা অন্য কোন স্থানে না রাখিতে চাও, না রাখ, কিন্তু এই অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষের ব্যবহারাদি সম্বন্ধে কতক রাখিতেই হইবে। চিরকালের জন্য অবশ্য কোন নিয়ম প্রণয়ণের আমরা পক্ষপাতী নহি। কিন্তু বর্ত্তমান কালের জন্য নিয়ম বা আচার ব্যবহার প্রণালী নির্দ্ধারিত না থাকিলে, যৌবন-বিবাহ প্রবর্ত্তনে যে কুফল ফলিবে, নীতি-শিথিলতা জন্মিবে, তাহা এক প্রকার স্থির নিশ্চয়।

যাঁহারা চরিত্র এবং ধর্ম্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এ সকল ভয়ের বিশেষ কোন কারণ নাই। কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিক লোক লক্ষের মধ্যে একজন মেলা ভার। চলিত ভাষায় যাহাদিগকে ধার্ম্মিক বলে, বিবাহরূপ কঠিন পরীক্ষার সময়, তাহাদিগের অনেকেরই পদস্খলন হয়, দেখা গিয়াছে। সুতরাং খুব সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত উচিত। সর্ব্বপ্রযত্নে বিলাসিতা এবং সাংসারিকতার স্রোত নিবারণ করিতে সকলের চেষ্টা করা উচিত। কেবল বক্তৃতায় নহে, কথায় নহে, কিন্তু নিজ নিজ জীবনের দৃষ্টান্তের দ্বারা চেষ্টা করা উচিত। সাংসারিকতার স্থানে স্বর্গের চিন্তা, বিলাসিতার স্থানে চরিত্রের মাহাত্ম্য যাহাতে বালক বালিকাদের মনে বদ্ধমূল হয়, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। এ কার্য্যের সহায়তার জন্য সর্ব্বদাই চরিত্রবান লোকদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে হইবে এবং বেশভূষামূলক বাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রতি ঘৃণা দেখাইতে হইবে। এবং বর কন্যা মনোনয়নের, সময় উভয়ের মনে যাহাতে বাহ্য সৌন্দর্য্য স্থান না পায়, তজ্জন্য প্রাণপণে সাহায্য করিতে হইবে। পূর্ব্ব হইতে এ সম্বন্ধে

অভিভাবকদিগের ও সমাজের যে গুরুতর দায়িত্ব আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে। এজন্য সমাজের বায়ু আমূল পরিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, বাহ্য চাকচিক্যাধিক্যে, অল্প দিনের দেখা সাক্ষাতে, হৃদয়গত মহত্ত্ব বুঝা বড়ই কঠিন। আমরা অন্যত্র এ কথাও বলিয়াছি যে, বিবাহের কথাবার্ত্তার পর আর অধিক দিন অপেক্ষা করাও উচিত নয়। আবার স্থানান্তরে একথাও বলিয়াছি যে, বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যার এক বাড়ীতে অবস্থিতি করা উচিত নয়। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা না করিলে এ সকল কথাতে ইহাই বুঝা যায়, আমরা বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যাকে পরস্পরের মহত্ত্ব জানিতে দেওয়ার কিছু বিরোধী। বাস্তবিক তাহা নয়। আমরা বিশ্বাস করি, মানুষ যখন স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় সরল এবং পবিত্র হয়, যখন বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, তখন ভগবানের বিধানে বরকন্যা অতি অল্প সময়েই পরস্পরকে চিনিতে পারে। যেখানে ধর্ম্ম নাই, পবিত্রতা-বোধ নাই, সেই স্থানেই যত গোল। বিবাহ কিছু অপবিত্র কার্য্য নয়। যাঁহারা খুব মনোযোগের সহিত আমাদের 'স্বামী স্ত্রী' নামক প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, এই মিলনকে আমরা কত পবিত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। তবে বিবাহের পূর্ব্বে গর্হিত নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য না হয়, এ সম্বন্ধে সতর্ক থাকা একান্ত উচিত। ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে আশঙ্কার কারণ অতি অল্প। সংসারাসক্ত লোকদিগের সম্বন্ধেই যত ভয়, এবং অনেক স্থলে তাহাদের দ্বারাই সমাজ কলঙ্কিত হয়। পরস্পরকে চিনিতে তাদেরই অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। রূপজ মোহ তাহাদিগকেই মাতায়। ধর্ম্ম ও চরিত্রহীন যুবক যুবতীর জন্যই এই সকল সতর্কতার কথা। রিপুর উত্তেজনায় স্বর্গের দেবতারও পদস্খলন সম্ভব, অগঠিত চরিত্র মানুষ কোন্ ছার জীব। এই জন্য বাধ্যবাধকতার বড়ই প্রয়োজন। এই সময় এ কথা গুলি ব্রাহ্মসমাজ এবং সমগ্র দেশ গভীর ভাবে চিন্তা করেন, এই আমাদের বিনীত অনুরোধ।

যে কারণেই হউক, ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু সমাজ হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়াছে। হিন্দুসমাজে কোন্ ঘরের পাত্রের সহিত কোন্ ঘরের পাত্রীর বিবাহ হইতে পারিবে, তার একটা নির্দ্দিষ্ট রেখা আছে। কিরূপ সম্বন্ধ থাকিলে, তাহা ভাঙ্গিয়া পাত্র পাত্রীর সহিত বিবাহ হইতে

পারিবে, তারও একটী নিয়ম আছে। অধিকন্তু সেখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা ও মনোনয়ন-প্রথার বাড়াবাড়ি নাই। পক্ষান্তরে সেখানে অভিভাবকেরাই নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দিষ্ট ঘরে পাত্র পাত্রীর সম্বন্ধ ঠিক করেন। অন্যদিকে, সেখানে বাল্য-বিবাহ অনেক স্থানেই প্রচলিত। সুতরাং সেখানে এ সকল বিষয়ে বড় একটা নীতিশিথিলতা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই (১)। ব্রাহ্ম সমাজের অবস্থা সেরূপ নয়। এখানে স্ত্রীস্বাধীনতা আছে, এখানে বর কন্যার মনোনয়নের প্রথা আছে, এখানে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত,—অথচ সম্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষা করিতে হয় না, এবং জাতিভেদ ইত্যাদি না থাকায় বাঁধা ঘর ইত্যাদিরও প্রয়োজন হয় না। এ সমাজের বিবাহ-প্রণালী নির্দ্ধারণে যে কি গভীর চিন্তার প্রয়োজন, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। ঈশ্বর পিতা, আমরা সকলে ভ্রাতা ভগ্নী—এই উদার এবং পবিত্র সম্বন্ধের মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে কয়জন ব্যক্তি? যে এত উপরে উঠিয়াছে, সে রিপু পরিচালনা না করিয়াও প্রেমের সাধনা করিতে পারে। প্রজাবৃদ্ধির কামনা, নিতান্ত অসার কামনা, যদি তাহার মূলে ভগবদ্ভক্তি না থাকে। আধ্যাত্মিক ভক্তি ও বিশ্বাসহীন লোকের দ্বারা যে প্রজাবৃদ্ধি হয়, সেটা নরকের ছবি; জগতের তাতে উপকার হয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। সেরূপ জন সংখ্যা বৃদ্ধিতে বরং দারিদ্র্যই বৃদ্ধি পাইতেছে। মাল্‌থাস্ এ সম্বন্ধে স্বীয় "জনসাধারণ" নামক পুস্তকে কত গভীর তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আধ্যাত্মিকতা লাভের জন্য আমরা বিবাহের এত পক্ষপাতী এবং মাল্‌থাসের মতকে উপেক্ষা করি। কিন্তু যে বিবাহের লক্ষ্য আধ্যাত্মিকতা নয়, সে বিবাহকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাঁহারা ধর্ম্মের ধূয়া ধরেন, তাঁহারাও রিপুর উত্তেজনায় মাতিয়া কাণ্ডাকাণ্ড শূন্য হন। তাঁহারা আবার ভগবানের পিতৃত্ব সাধনের দোহাই দিয়া (২) ভগ্নীকে বিবাহ করিতে উদ্যোগী! ছি, কি ঘৃণিত কথা!! ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে সকলের একরূপ ধারণা হইবে কেন? লোকের

(১) তবে কন্যার বিবাহ দেওয়া হিন্দু সমাজে যেরূপ বহু ব্যয় সাপেক্ষ হইয়া পড়িতেছে, বরের পণ যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহার গতিরোধ না হইলে,—হয় কন্যাবধ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে, না হয়, যুবতী বিবাহ প্রচলিত হইবে। সে সময়ে যে নীতিশিথিলতার যথেষ্ট সম্ভাবনার উদয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি ব্যক্তিগণও খুব চিন্তিত।

(২) নব্যভারত চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় তৃতীয় সংখ্যা দেখ।

নিকট উপদেশ পাইয়া ঈশ্বরের যে স্বরূপবোধ জন্মে, সেটা প্রকৃত স্বরূপ-বোধ নয়। যাহারা শাস্ত্র মানে না, তাহারা সার্ব্বভৌমিক ঈশ্বর-স্বরূপ যে কি সূত্রে স্বীকার করিবে, বুঝি না। এখানে আদেশ বা বিবেকের কথাই অধিক প্রতিপাল্য। ভগবান যার নিকট তাঁর যে স্বরূপ প্রকাশ করেন, তাহাই সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। স্বরূপ স্বীকার করা (belief) ও স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা (faith), স্বতন্ত্র কথা। সন্দেশের মিষ্টত্ব অন্যের মুখে শুনিয়া স্বীকার করা এবং নিজে আহার করিয়া মিষ্টত্ব ধারণা করা এ দুয়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সার্ব্বভৌমিক স্বরূপ-স্বীকার, গুরু ও শাস্ত্র তন্ত্রবিরোধী ব্রাহ্মের পক্ষে অসম্ভব। ভগবান যার ভিতরে তাঁর অনন্ত স্বরূপের যে দিকটা প্রকাশ করিতে চান, সেইটাই হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি যে স্বরূপে যে ভাবে মানুষের কাছে উপস্থিত হন, সেই ভাবই তার হৃদয়ঙ্গম হয়। অনন্তস্বরূপ স্বয়ং এই রূপে অনন্ত প্রকৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশিত না হইলে, কার সাধ্য আছে, তাঁকে স্বরূপতঃ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবে? তাঁর আদেশেই কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ ভাই, কেহ ভগ্নী, কেহ স্বামী, কেহ স্ত্রী, ইত্যাদি। ঈশ্বরের পিতৃত্বই যে সকলের পক্ষে সাধনার বস্তু, তা নয়। কেহ পিতারূপে, কেহ স্বামীরূপে, কেহ শক্তি-রূপে, কেহ বন্ধুরূপে, নানা রূপে নানা সাধক তাঁকে দেখেন, তাঁর স্বরূপ যে সকলের নিকট একরূপ, তা নয়। যাঁর নিকট তিনি যে ভাবে প্রকাশিত, সে তাঁর সেই রূপই ধরিবে, সেই রূপই বুঝিবে। যে তাঁকে স্বামীরূপে দেখিবে, সে কিছু পৃথিবীর নরনারীকে ভাই ভগ্নী রূপে দেখিবে না। এ সকল কথা একটু সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারি-বেন। আমরা যে কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছি, সে কথাটী এই,—ভগ-বান যাহাকে ভগ্নীরূপে হৃদয়ে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন, তাকে আর স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা যায় না। আজ এক রূপ কাল অন্য রূপ, এরূপ তাঁর বিধানই নয়। ভগবান যদি তাঁর মেয়েকে ভগ্নীরূপে চিনাইয়া না দিয়া থাকেন, তবে তাকে ভগ্নী বলিয়া ডাকিব না। আর যদি চিনাইয়া দিয়া থাকেন, তবে চিরকাল ঐ এক সম্বন্ধ থাকিবে। সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন ঘটে,—ঘটিতে পারে তখন, যখন মানুষ রক্ত মাংসের সম্বন্ধও মানে না, এবং বিধাতার আদেশও বুঝে না, বা মানে না। তখন,—যখন মানুষ আপন খেয়ালে কাহাকে মা, কাহাকে দিদি, ইত্যাদি কথায় সম্বোধন করে। উপপতি বেশ্যাকে মা বলিয়া ডাকে,

অথচ তাতেই উপগত হয়। এইরূপে পবিত্র সম্বন্ধগুলিকে ঘৃণিত করিয়া ফেলা কি উচিত?—আমরা বিনীত ভাবে সকলকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। এরূপ খামখেয়ালির ডাকাডাকিতে যে কিরূপ বিপদ ঘটিতে পারে, বুঝাইয়া বলিতে হইবে কি? তবে কয়েকটী কথা বলিতেছি।

মনে করুন, একটী গৃহস্থ কয়েকটী অনাথ বালক এবং অনাথ কয়েকটী বালিকাকে বাড়ীতে স্থান দিয়াছেন। সকলেই খেয়াল অনুসারে পরস্পরকে দাদা, দিদি বলিয়া ডাকিতেছে। অভিভাবক, এ পবিত্র সম্বন্ধের মধ্যে যে অপবিত্র ভাব আসিতে পারে, তাহা বুঝিতেছেন না। সুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। এদিকে ভিতরে ভিতরে কোন বালক বালিকার মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু বাহিরের যেমন ডাকাডাকি, তেমনই চলিতেছে। অভিভাবক পূর্ব্ববৎ নিশ্চিন্ত আছেন। ক্রমে ক্রমে কীট দেখা দিল। ক্রমে কীটে কুসুম কাটিল;—নীতির মূল ছিন্ন হইল। অবশেষে অভিভাবক বুঝিলেন। তখন হায় হায় পড়িয়া যাইল। এরূপ প্রতারণার জন্য দায়ী কে? এরূপ প্রতারণা নিবারণের জন্য সমাজ কি কোন উপায় অবলম্বন করিবেন না? স্ত্রী-স্বাধীনতা ও যৌবনবিবাহ যে সমাজে প্রচলিত, সে সমাজে, দুশ্চরিত্রতা নিবারণের জন্য, সম্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষার চেষ্টা করা কি সর্ব্বতোভাবে উচিত নয়? এইরূপ সম্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষা না করিয়া ভগ্নীকে ভাজকে বিবাহ করিয়া কি ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা সাধারণের চক্ষে ঘৃণিত হইয়া যান নাই? যে ব্যক্তি এইরূপ জঘন্য কাজ করিয়া আবার নিজে এই মতের পোষকতা করে, তার ন্যায় ভণ্ড আর কে আছে? সম্বন্ধের ভিতরে ভগবানের যে বিধান বর্ত্তমান, সেই বিধান না বুঝিলে সম্বন্ধ পাতান উচিত নয়। যিনি শিক্ষক, তাঁহাকে ছাত্রীদিগকে কন্যাবৎ দেখিতে হইবে। যিনি অভিভাবক, তাহাকে অধীনস্থ মেয়েদিগকে মা, ভগ্নী বা কন্যারূপে দেখিতে হইবে। নচেৎ সে ব্যক্তিকে শিক্ষক বা অভিভাবকরূপে রাখিলে ভয়ানক বিপদ ঘটে,—ভয়ানক বিপদ স্থানে স্থানে ঘটিয়াছে। ঈশ্বরের বিধান তোমার আমার সুযোগে কিছু পরিবর্ত্তিত হইবার নয়। সুতরাং যখন বিধানানুসারে এক সম্বন্ধ ঠিক হইল, সে সম্বন্ধের আর অন্যরূপ হইতে দেওয়া উচিত নয়। এরূপ যদি না হয়, তবে স্বাধীনতা এবং স্বেচ্ছাচারিতার দিনে, রিপুর উত্তেজনায় মানুষ যে এইরূপে বাহিরের পাতান-সম্বন্ধ-রূপ আচ্ছাদনে লুকাইয়া লুকাইয়া, পদে পদে

কত ঘৃণিত কার্য্য করিতে সুবিধা পাইবে, তার ইয়ত্তা নাই। অতএব সম্বন্ধের গাম্ভীর্য্য এবং স্থায়ীত্ব রক্ষা করা আমাদের মতে একান্ত উচিত।

এক বাড়ীতে যে সকল নরনারী বাস করেন, আমাদের মতে তাহাদের মধ্যেও বিবাহ প্রচলিত হইতে দেওয়া উচিত নয়। তবে স্থলবিশেষে, অপরিহার্য্য হইলে, অনেক বৎসর অপেক্ষার পর বিবাহ হয়, হউক। এক বাড়ীতে থাকার সময় বিবাহের সম্বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত উচিত নয়। যদিও বা ঘটনা পরস্পরায় হয়, তবে তাহা তখনই অভিভাবকদিগকে জানান উচিত। তারপরই বর কন্যাকে পৃথক রাখা উচিত এবং একবৎসর—দুই বৎসর অন্ততঃ অপেক্ষা করা একান্ত উচিত। নচেৎ চরিত্রহীনতার অনিবার্য্য কুফল হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার আর উপায় থাকে না। আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার পক্ষপাতী, কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবার একটা বিবাহ পাতনের আড্ডা হয়, ইহা আমরা চাই না। বিবাহটা অপবিত্র কার্য্য বলিয়া নয়, কিন্তু এরূপ স্থলে পতনের সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমরা বিরোধী। যতদূর সম্ভব পতনের সম্ভাবনা নির্ম্মূল করা উচিত। আমরা মনে করি, প্রতিপালক, অভিভাবক বা শিক্ষকের সহিত অধীনস্থ বালিকার বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। এ সকল স্থানে খুব সতর্কতা অবলম্বন না করিলে, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতায় দারুণ গরল উৎপন্ন হইবে।

আমরা পূর্ব্ব কয়েক পরিচ্ছেদে যাহা বলিয়াছি, সংক্ষেপে আবার বলি। কার কার সহিত কোন্ কোন্ স্থানে বিবাহ হইতে পারিবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। সম্বন্ধের পবিত্রতা ও স্থিরতা রক্ষা করা উচিত। এক বাড়ীতে দীর্ঘকাল থাকা কালীন, এবং এক স্কুলে অধ্যয়নের সময় সম্বন্ধ পাতান উচিত নয়। সম্বন্ধের পূর্ব্বে অভিভাবকদিগের মতামত জানা উচিত। তারপর, সম্বন্ধ ঠিক হইল কি না, ইহা জানিবার জন্য ভগবানের বিধান বুঝা উচিত। তারপর আলাপাদির সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত। সে সময়ে বিশেষ ২ ব্যক্তিগণের উপর বর কন্যার আচার ব্যবহার ও চালচলতি পরীক্ষার ভার রাখা উচিত। ইহার পূর্ব্ব হইতে বর কন্যার মন হইতে সাংসারিকতা দূর করিয়া দিতে চেষ্টা করা উচিত। বাহ্যরূপ যে কিছুই নয়, ইহা বুঝান উচিত। মোট কথা, খুব সতর্কভাবে তাহাদের চরিত্র গঠনে চেষ্টা করা উচিত। সম্বন্ধ ধার্য্য হইলে অধিক দিন অপেক্ষা করা উচিত নয়। কারণ, তাহাতে মন এক চঞ্চলতার অবস্থায় থাকে, তাতে

মানসিক দুর্ব্বলতা ঘটা অসম্ভব নয়। তবে যেস্থলে সাধারণ নিয়মের অন্যথা হইয়াছে, অর্থাৎ যেখানে কতকটা দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইয়াছে, সেখানে বর কন্যাকে অনেক দিন ধরিয়া পৃথক রাখিয়া মনের গতি পরীক্ষা করা উচিত। এবং নিতান্ত আবশ্যক হইলে অনেক দিন পর বিবাহ দেওয়া উচিত।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিয়া কি সমাজকে পবিত্র রাখা যায়?—বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিলে লোক পাপ কার্য্য করিতে আরো সুবিধা পাইবে। এ সকল কথা খুব সত্য। বিধাতা মানুষকে পবিত্র না রাখিলে, মানুষ মানুষকে পবিত্র রাখিতে পারে না। তাই বলিয়া মানুষ না ভাবিয়া, না চিন্তা করিয়া থাকিতে পারে না। ইহার ভিতরেও ভগবানের বিধান রহিয়াছে। মানুষ কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে যাহা বুঝিতে পারে, তাহাই করিবে। তাতে সমাজ রক্ষা না হইলে, আর মানুষের হাত নাই। চেষ্টা করিয়া ফল না পাইলে দুঃখ কি, ক্ষোভ কি?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বাল্য বিবাহের পরিপোষক মত খণ্ডন।

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিবাহ-প্রস্তাব সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত করার কথা বলিয়াছি, তাহার কোন্‌টি অগ্রে পালনীয়, কোন্‌টি পরে, সে সম্বন্ধে কোন নিয়ম থাকিতে পারে না। মোট কথা, অভিভাবকের মত জানা, ভগবানের বিধান বুঝা, বর কন্যার মতামত গ্রহণ করা, এ সকলই প্রয়োজনীয়। তবে কোন্‌টি অগ্রে কোন্‌টী পশ্চাতে, সে সম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি নিয়ম রাখা সম্ভব নয়। যে স্থলে যেরূপ দাঁড়ায়, সে স্থলে সেই রূপই হইবে। মোট কথা, ঐ সমস্ত কথা গুলি প্রতিপালন করিয়া চলিতে চেষ্টা করা একান্ত উচিত।

কেহ কেহ এ প্রশ্ন তুলিয়াছেন, এই স্বাধীনতার যুগে, স্থান বিশেষে যে বিবাহ হইতে পারিবে না, ইহা ধার্য্য করা কি উচিত? ইহাতে ত স্বাধীনতার খর্ব্ব হয়! বলেন, শিক্ষক ও ছাত্রীর সহিত, অভিভাবক ও তাহার অধীনস্থ পাত্রীর সহিত বিবাহ হইতে পারিবে না কেন? স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিলে বিবাহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে কি রূপে?

এ সকল কথার উত্তর দিতে আমাদের ইচ্ছাও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। আমরা এরূপ স্বাধীনতার বড় পক্ষপাতী নই। যেখানে রক্ত মাংসের সংস্রব আছে, সেখানে বিবাহ হইতে না পারা যদি বিজ্ঞানসম্মত হয়, এবং তাহাতে যদি স্বাধীনতার খর্ব্ব না হয়, তবে যেখানে ভগবানের বিধানে একটা সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেখানে সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া বিবাহ সম্বন্ধ পাতানও নীতি-বিজ্ঞান-সম্মত হইতে পারে না। সে ব্যক্তির স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হওয়া অন্যায়, যে ব্যক্তি ছাত্রীকে পবিত্রচক্ষে দেখিতে না পারে, এবং সে ব্যক্তির কোন বালিকার অভিভাবক স্থানীয় হওয়া উচিত নয়, যে ব্যক্তি বালিকাকে আপন কন্যার ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিতে না পারে। এরূপ নিয়ম না থাকিলে বিশ্বাসের একটী ভিত্তি থাকে না—সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়। একটী ছাত্রীকে যখন স্কুলে দেওয়া হইয়াছে, তখন একথা ভাবিয়া কিছু দেওয়া হয় নাই যে, শিক্ষকের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান লাভ করিবে, ইহাই উদ্দেশ্য। এখন সুযোগ পাইয়া যদি শিক্ষক তলে তলে ছাত্রীর সহিত প্রণয় পাতায়, তবে তাহা যে পবিত্র সমাজ-নীতিবিগর্হিত কার্য্য হয়, এবং সে ব্যক্তিকে যে আর বিশ্বাস করা যাইতে পারে না, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে কি না, জানি না। স্থানে স্থানে এইরূপ অনুরাগ সঞ্চার হইতে দেখা গিয়াছে বলিয়া, আজ কাল অনেক ব্যক্তি বালিকাদের শিক্ষার জন্য পুরুষ-শিক্ষক নিযুক্ত করিতে অত্যন্ত আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন। বাস্তবিক খুব সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, এ সকল স্থলে স্বাধীনতাকে একেবারে খর্ব্ব না করিলে, কোন মতেই নীতি রক্ষার সম্ভাবনা নাই। পিতা মাতা, ও ভ্রাতা ভগ্নীর সম্বন্ধ যেরূপ ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট; শিক্ষক ও ছাত্রীর, অভিভাবক এবং তাহার অধীনস্থ বালিকার সহিত সেইরূপ সমাজনির্দ্দিষ্ট ও ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ মনে করা উচিত। সমাজ অনেক স্থলে ঈশ্বরেরই দূতের ন্যায় কার্য্য করেন, সুতরাং এ সম্বন্ধও প্রকারান্তরে ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট। যাহারা তাহা মনে করিতে না পারে, সে শিক্ষক বা সেই অভিভাবকের হস্তে কোন বালিকার ভার দেওয়া উচিত নয়। এস্থলে স্বাধীনতা যত শীঘ্র কর্ম্মনাশার জলে প্রক্ষিপ্ত হয়, ততই ভাল।

আর একটী স্থলে স্বাধীনতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পাত্র ক্রমাগত দুই দশটী পাত্রী দেখিতেছেন, কিন্তু কোন পাত্রী মনোনীত হইতেছে

না। পাত্র অন্যত্র আবার অন্য পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতেছেন। এইরূপ ক্রমাগত নূতন নূতন পাত্রী দেখিয়া বেড়ানে স্বাধীনতা আছে কি না? একথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে একটী প্রশ্ন করি। মনে কর, পাত্রীর বর পছন্দ হইতেছে, কিন্তু পাত্রের পাত্রী পছন্দ হইতেছে না,—এরূপ স্থলে পাত্রীর মন বিচলিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না? ক্রমাগত নূতন বর আসিতেছে, কিন্তু যাহাকে পছন্দ হইতেছে, তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না, এস্থলে মনে দুশ্চিন্তা বা অভিমানের উদয় হওয়া সম্ভব কি না? যদি সম্ভব হয়, তবে ইহার জন্য দায়ী কে? এদেশে এবং অন্য দেশের কাহিনীতে এরূপও শুনা গিয়াছে, বরের নিকট আশ্বাস পাইয়া, মনের মধ্যে একটী বাসনাকে বসাইয়া, এবং সময়ে সেই বরকে না পাইয়া, কত বালিকা আজন্মের জন্য অবিবাহিতা থাকিয়াছেন। এইরূপ আশ্বাসিতা কত বালিকা, অন্যত্র বিবাহিতা হওয়া সত্ত্বেও, স্বামীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারে নাই। এ সকল যে কি গভীর চিন্তার বিষয়, ধারণাও করা যায় না। আমরা দেখিয়াছি, কোন কোন বালক, স্বীয় বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, ক্রমাগত নূতন নূতন পাত্রী দেখিয়া ফিরিতেছেন; জিজ্ঞাসা করিলে বলেন,—"পছন্দ হয় না কি করিব? যাকে তাকে ত আর বিবাহ করিতে পারি না। স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিতে বলেন"? এইরূপ স্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত কি না? এবং এজন্য মেয়েদিগকে বাজারের ন্যায় সাজাইয়া রাখা উচিত কি না? আমাদের মতে কখনই উচিত নয়। ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন প্রবীণ ব্যক্তি বর্ত্তমান সময়ে বিবাহ বিষয়ক আন্দোলনে একটা প্রধান যুক্তি এই ধরিয়াছেন যে,বর কন্যার মনোনয়নে ঈশ্বর-প্রদত্ত স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিবার কি অধিকার আছে? এই স্বাধীনতা যে মানুষের কতদূর আছে, সে বিষয়ে একটু চিন্তা করা উচিত। ১৪ বৎসরের সময়, না ১৮ বৎসরের সময়, কোন্ সময় বালক বালিকারা স্বাধীন? দেশের প্রচলিত আইন ২১ বৎসর বয়সের সময় স্বাধীনতা দিয়াছেন। কিন্তু তাহাই কি স্বাধীনতার পক্ষে যথেষ্ঠ মনে কর? আজ স্বাধীন মতে একজনকে এক ব্যক্তি বিবাহ করিল। পাঁচ বৎসরের পর স্বাধীন স্বামী আর স্ত্রীতে মন বাঁধিতে পারিতেছেন না; তার মন অন্য পাত্রীতে পড়িয়াছে। এরূপ স্থলেও কি স্বাধীনতার কথাই জয়যুক্ত হইবে? না কিছু বাধ্যবাধকতা থাকিবে? একথাও নয় ছাড়িলাম। মনে কর, একটী

পাত্র একটী পাত্রীকে প্রলোভন দেখাইয়া আপনাতে অনুরক্ত করিয়াছে, তার সহিত এমন সকল ব্যবহার করিয়াছে, যাহাতে কিছু নীতি-শিথিলতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিছুদিন পর সেই যুবক আর পাত্রীকে বিবাহ করিতে চায় না,—সে বলে, আমি মন বাঁধিতে পারিতেছি না। এরূপ স্থলেও তার স্বাধীনতাকে পূজা করিয়া চলা উচিত কি না? আমরা জানি না, এমন কোন ব্যক্তি আছে কি না, যিনি এই সকল স্থলেও বলিবেন যে—স্বাধীনতার পূজা করাই উচিত। আমরা এরূপ স্বাধীনতাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। ইহা স্বাধীনতা নয়, ইহা স্বাধীনতার আচ্ছাদনে স্বেচ্ছাচারিতা বিশেষ; ইহা যত শীঘ্র সমাজ হইতে বিদূরিত হয়, ততই মঙ্গল। স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতাকে বুঝিতে পারা বড়ই কঠিন। আমরা পূর্ব্বে একটী প্রবন্ধে এ সকল কথার অনেক আলোচনা করিয়াছি। আমরা স্বাধীনতা ও অধীনতা নামক প্রবন্ধে (১) প্রমাণ করিয়াছি যে, মানুষ কেবল স্বাধীনতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই—সে অধীনও। মানুষ পিতা মাতার অধীন, ভ্রাতা ভগ্নীর অধীন, আত্মীয় বন্ধুর অধীন, সমাজের অধীন, দেশের অধীন, রাজার অধীন। অধীন হইতেও অধীন। পরস্পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়াই আমরা যেন উন্নতি লাভ করিতেছি। পরস্পরের সাহায্য, পরস্পরের সদুপদেশ, পরস্পরের উপকার ভিন্ন মানুষ, মানুষ হইতে পারে না। হাজার বল, চেষ্টা করিলেও এই বিশ্বব্যাপী অধীনতার শৃঙ্খল—সংসারের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করা যায় না। এই মোহময় পৃথিবী, এই মায়াপূর্ণ গৃহ পরিবারের কেন্দ্র— দাস-ব্যবসায়ের আড্ডা মাত্র। এমন দেশ নাই, যেখানে এই দাসত্ব প্রথা প্রচলিত নাই। যেখানে মানুষ, সেই খানেই পরিবার, সেই খানেই সমাজ, সেই খানেই রাজা। শাসন ভিন্ন, উপদেশ ভিন্ন, সাহায্য ভিন্ন, এক দিনও মানুষের চলে না। অন্যান্য স্থলে পরস্পরের সাহায্য পরস্পরে লইব, কিন্তু এই বিবাহের সময় নয়? একথা, কথাই নয়। সর্ব্ব দেশে—বিবাহের সময় সমাজের শাসন, অভিভাবকের আদেশ বা রাজার অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া চলিতে হইতেছে।

ইউরোপ খণ্ডে যুব স্বাধীনতার প্রচার হইয়াছে, কিন্তু সে দেশ সম্বন্ধে ষ্টেটস্‌ম্যান সম্পাদক বলেন, "It is certainly not in India only, that parents choose the life-partner of their children. Over the greater part

(১) জ্যোতিকণা—৫৭ পৃষ্ঠা দেখ।

of Europe, young people have we suspect little practical choice in the matter." ভারতবর্ষে যেরূপ অভিভাবকেরা পাত্রী মনোনয়ন করেন, ইউরোপেও প্রায় তদনুরূপ হয়। ইংলণ্ডেও অনেক স্থলে এই নিয়ম (১) প্রচলিত। আমরা বলি, ইহা সুপ্রণালী। তবে যাহারা বিবাহ করিবে, তাহাদের মতামতকে একেবারে উপেক্ষা করাও উচিত নয়। ধর্ম্মহীন অল্পবয়স্ক ও অগঠিত-চরিত্র বালক বালিকাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার উপর ছাড়িয়া দিলে, তাহারা যে কতদূর দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিবে, কল্পনাও করা যায় না। যে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান লাভ না হয়, যে পর্য্যন্ত চরিত্র গঠিত না হয়, সে পর্য্যন্ত মানুষ পদে পদে অন্যের অধীন। বয়স অধিক হইলেই মানুষ স্বাধীনতা পাইবার অধিকারী হইতে পারে না। ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাজাকে বাধ্য হইয়া বয়সের ভিত্তির উপর উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম স্থাপন করিতে হইয়াছে ; কিন্তু সেটা আদর্শ নয়। যে সমাজের লক্ষ্য ধর্ম্ম, সে সমাজে চরিত্র, এবং ধর্ম্মজ্ঞানের উৎকর্ষতার উপরই স্বাধীনতা ও অধীনতার প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করা উচিত। যে ব্যক্তি যত ধর্ম্ম ও চরিত্রহীন, সে তত আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব, সমাজ ও রাজার অধীন। চরিত্রহীন ব্যক্তির স্বাধীনতা—স্বেচ্ছাচারিতা বিশেষ, তাহার কথা মুখে আনিও না। তাহাদের সম্মতি বা অসম্মতির কোন কিছু মূল্য নাই। দেখা যায়, আজ যে কার্য্যে তাহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কাল সে কাজে তাহারা শিথিল-প্রতিজ্ঞ। আজ যাতে তাদের সম্মতি, কাল তাতে তাদের অসম্মতি। চরিত্রহীন, ধর্ম্মভিত্তিহীন লোকের দাঁড়াইবার ঠাঁই নাই। তাহারা ক্রমাগত স্রোতের শৈবালের ন্যায় এদিক সেদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। তাদের সম্মতি ও অসম্মতির কোনই মূল্য নাই। বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে আরো যে শত সহস্র যুক্তি আছে, সেই গুলি প্রয়োগ করিতে চাও, কর, কিন্তু ১৪, ১৫ বা ১৮ বৎসরের বালক বালিকার সম্মতির অধিকারের কথা তুলিও না। তাহাদিগকে অধিক স্থলেই অভিভাবক এবং সমাজের কথা মান্য করিয়া চলিতে হইবে। তাদের পক্ষে, তাহা অধর্ম্মও নয়। অভিভাবক এবং সমাজকে উপেক্ষা করিতে যদি শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তাহাদের যে কি শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিবে, কল্পনা করিলেও হৃদকম্প উপস্থিত

(১) See—The speeches of Eminent Indian gentlemen on "Hindu Marriage Customs." Page 84 and 88, &c. Speeches of Babu Bishnu Pada Chatterjee, B. L, and Dr. Rajendra Lala Mitra C. I. E.

হয়। আমরা এরূপ স্থলে সমাজকে উদাসীন দেখিয়া সময়ে সময়ে মর্ম্মে দারুণ আঘাত পাইয়াছি, লোকের উপর আর বিশ্বাস স্থাপন করিতে ইচ্ছা হয় না। খুব যাহাদের উপর আশা ছিল, পরীক্ষারূপ ঝটিকার দিনে দেখিয়াছি, তাহারা স্রোতের শৈবালের ন্যায় কোন্ পূতিগন্ধময় নরক প্রদেশে ভাসিয়া যাইতেছে! নীতির-বন্ধনে, সমাজ-বন্ধনে মানুষকে আঁটিয়া না বাঁধিলে, সমাজকে ধর্ম্মের অনুকূল করিয়া রাখিবার আর কি উপায় আছে, আমরা জানি না।

যাঁহারা এই সকল বিষয়ে অপরাধী, তাঁহারা আমাদের কথার প্রতিবাদ করিবেন, আমাদের উপর বিরক্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। যাঁহারা অবিবাহিত রহিয়াছেন, তাঁহারাও এই সকল বাঁধাবাঁধির কথা শুনিলে বিরক্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্ম-পিপাসু চরিত্রবান্, যাঁহারা চিন্তাশীল, যাঁহারা সংসারের অভিজ্ঞতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা যে কেন আমাদের প্রতি বিরক্ত হইবেন, আমরা আজও তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহাদের বিরক্তি দেখিয়া, আমরা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কিছু আশা-শূন্য হইয়া পড়িতেছি।

যে উপলক্ষে 'যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ' নামক প্রবন্ধ আমরা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে উপলক্ষটি মালাবারি মহোদয়ের বাল্যবিবাহ রহিতের জন্য আইন করার প্রস্তাবের আন্দোলন। ক্রমে রুক্মবাই সংক্রান্ত মকর্দ্দমা উপস্থিত হইল। আন্দোলনের পর আন্দোলন চলিতে লাগিল, অবশেষে বর কন্যার বিনা সম্মতিতে যে বিবাহ হইয়াছে, কিম্বা বিবাহের পর যাহাতে কোন সম্মতিসূচক কার্য্য ঘটে নাই, এইরূপ বিবাহ রহিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা উচিত কি না, এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। মালাবারি মহোদয়ের উত্তেজনায় গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে প্রদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের মত গ্রহণ করিয়াছেন। *প্রদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ আবার ভারতের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের মত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে জানা গিয়াছে যে, প্রায় সকলেই একবাক্যে বাল্যবিবাহের অপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন,

---

*এটী ৪৮ পৃষ্ঠার (১) নং নোটে সংযুক্ত হইবে ;—

"In many highly civilized countries, such as France, girls have ordinarily very little voice in the choice of their husbands." J. Monteath, C. S. Under Secretary to the Government of Bombay, General Dpt.

কিন্তু কেহই আইন করার পক্ষপাতী নন্ (১)। দেশের মধ্যেও এ সম্বন্ধে খুব লেখালেখি আরম্ভ হইয়াছে। এক পক্ষ বাল্যবিবাহের পোষকতা করিতেছেন, অন্য পক্ষ তাহার বিরুদ্ধে লিখিতেছেন। যাহা হউক, যে উদ্দেশ্যে আমরা এই প্রবন্ধ নব্যভারতে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা কতক সংসিদ্ধ হইয়াছে। উভয় পক্ষের অনেক ব্যক্তিই বিবাহ ভঙ্গের জন্য আইন করার বিরোধী। এটা একটা সুলক্ষণ, সন্দেহ নাই। বিবাহভঙ্গ-প্রথা প্রচলিত হইলে, যে বিবাহে সম্মতি ছিল, তাকেও অসম্মতিসূচক বিবাহ বলিয়া প্রতিপন্ন করা বড় কঠিন কথা নয়। ইচ্ছা হইলে, সন্তান উৎপন্ন হইলেও, চরিত্রে দোষারোপ করিয়া অসম্মতিসূচক বিবাহ বলিয়া তাহা ভঙ্গ করিতে লোক প্রস্তুত হইতে পারে। মোট কথা, বিবাহ-ভঙ্গ-প্রথায় দোষের ভাগই অধিক, গুণের ভাগ থাকিলেও অতি অল্প। খাম-খেয়ালির প্রশ্রয় পায়, ইহা কখনই উচিত নয়। এক বাক্যে এ সম্বন্ধে গবর্ণ-মেণ্টের নিকট সাধারণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা উচিত। ইহাতে হিন্দু-বিবাহের মূল ভিত্তিহীন হইবে। এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোবিন্দ সোম মহাশয় এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, সে সমস্তের মধ্যে অতি উদার এবং চিন্তা পূর্ণ কথা। কিন্তু ভুল ভ্রান্তিও যথেষ্ট আছে। আমরা এস্থানে সকল গুলির একটু আলোচনা করিব। জয়গোবিন্দ বাবু তাঁহার পুস্তকে বলেন, "What God hath joined together let no man put sunder" ভগবান দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাকে ভঙ্গ করিও না। এটি খ্রীষ্টের অতি সুন্দর কথা। কি জ্বলন্ত বিশ্বাসের কথা! সেণ্ট-পল বলিয়াছেন, "The woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth" স্বামীর অনুগত হইয়া চিরকাল থাকা স্ত্রীর উচিত। খ্রীষ্টান সমাজ, খ্রীষ্ট এবং সেণ্টপলের এই মহৎ বাক্যকে অমান্য করিয়া চলিয়া যে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। সে কথা থাকুক। জয়গোবিন্দ বাবুর কথার সহিত এ পর্য্যন্ত আমরা খুব ঐক্য। কিন্তু যে সকল বিবাহে ভগবানের ইঙ্গিত পাওয়া যায় নাই, সে স্থলে কিরূপ হইবে?—এ সম্বন্ধে তিনি বলেন,

(১) See Records from the government of India. no CCXXIII. Page 8-10, opinions of the Madras Government. Page 37-39, Do of the Bombay Government. Page 198-199, Do of the Bengal Government. Page 248-252, Do of the North Western Provinces. Page 253, Do of the Punjab Government ; &c. &c.

("In after times God has accomplished this union through human agencies") অর্থাৎ—পরে ভগবান মনুষ্যের দ্বারায় এই মিলন সংঘটন করিয়াছেন। বিধাতা, কোন কোন সময়ে, মানুষের ভিতর দিয়া, সমাজের ভিতর দিয়া বা রাজার ভিতর দিয়া কার্য্য করেন, সত্য, কিন্তু মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা (free-will) স্বীকার করিতে গেলে, মানুষের সকল কার্য্যই যে বিধাতার কার্য্য, তা কখনই মনে করা যায় না। মানুষ স্বেচ্ছা, স্বার্থ, বা খামখেয়ালির বশবর্ত্তী হইয়া যে কার্য্য করে, তা বিধাতার কার্য্য নয়। যদি তা হয়, তবে যাহারা বিবাহ ভঙ্গ করে, তাহাদের সে কার্য্যকেও বিধাতার কার্য্য বলিয়া মনে করিতে হয়। যাঁহারা পাপপুণ্য স্বীকার করেন, তাঁহারা মানুষের সমস্ত কার্য্যকে কখনই বিধাতার কার্য্য বলিয়া মনে করিতে পারেন না। অনেক স্থলে দেখা যায়, ৫০।৬০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির সহিত, টাকার লোভে, কেহ বা অন্য স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ১১।১২ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ দিতেছেন! টাকার লোভে যে কত পাত্রীকে জলে বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ইহা অপেক্ষা দুঃখের চিত্র আর কি আছে (১)! এইরূপ কার্য্যও কি বিধাতার কার্য্য? না—তাহা কখনই নয়। এইরূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য, বিবাহ ভঙ্গ করিতে দেওয়া উচিত কি না, আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না। এ সম্বন্ধে জয়গোবিন্দ গুপ্ত একরূপ নির্ব্বাক। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, এরূপ স্থলে বিবাহ-ভঙ্গ-প্রথা যদি প্রচলিত থাকে, তাহাতে দোষের বিষয় না থাকিলেও, আমরা ইহাকেও নানা কারণে আদর্শ বলিয়া মনে করিতে পারি না। সে সমস্ত বিস্তৃত কারণ এখানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। তারপর তিনি বলিতেছেন—"In the case of the first marriage on record, God actually brought the woman unto the

(১) এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় কি সুন্দর কথা বলিয়াছেন, দেখুন;—"বিবাহকে অর্থাগমের উপায় বলিয়া মনে করিলে, বিবাহ বৈদেশিক চুক্তির অপেক্ষাও শতগুণে অপবিত্র হয়।" Speeches of Eminent Indian gentlemen on H. M. C. P. 53.

"But when an infant bride is to be married to an old man upwards of 45 or 50 years of age, either as his first wife, or as his second or third during the lifetime of the first wife, either out of necessity or otherwise, matters become worse and it is indispensably necessary to put a stop to such practices at once." Mr. Tirmal Rao Venkatesh, Inamdar at Dharwar.

man and gave her unto him, to be his wife, &c."—এ স্থলে তাঁর কথার সামঞ্জস্য কেমন করিয়া রক্ষা পায়, তাহা বুঝিলাম না। বিধাতা যখন রমণীকে প্রথম পুরুষের নিকট আনিয়াছিলেন, তখন কি রমণী এবং পুরুষ বালক বালিকা ছিল? সে কথার স্পষ্ট মীমাংসা জয়গোবিন্দ বাবু করেন নাই। আমাদের বিবেচনায়, তাহারা তখন বালক বালিকা ছিল না। কারণ—বিধাতার বিধান সেরূপ নয়। জীবনে এমন একটা সময় আছে, যে সময়ে বিধাতা পুরুষকে রমণীর প্রতি আকৃষ্ট করেন। সে সময়টী যৌবনকাল। এই যৌবনকালের পূর্ব্বে বিধাতা রমণীকে পুরুষের নিকট আনিতেছেন, একথা কথাই নয়। তাহা হইলে, যৌবন নামক স্ত্রীপুরুষের আকর্ষণের একটী বিশেষ সময় মানুষের জীবনে ঘটিত না। শরীরের বিকাশের সহিত মনের বিকাশ, মস্তিষ্কের পরিপুষ্টির সহিত ধর্ম্মজ্ঞানের উন্মেষ, রিপুর বিকাশের সহিত দাম্পত্য প্রেমের বিকাশ, এই যৌবনকালেই হয়। এ সকল প্রত্যক্ষ সত্য। ইহার প্রমাণের জন্য আর ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে হয় না। "পিতা মাতাকে বালক বালিকা ভালবাসে, সুতরাং বালক স্বামী বালিকা স্ত্রীকে ভালবাসিতে পারিবে না কেন?" জয়গোবিন্দ বাবুর এটা যে কিরূপ যুক্তি, বুঝিলাম না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যৌবনকালের পূর্ব্বে বালক বালিকার সন্তান হয় না কেন? পিতা মাতাকে ভালবাসা ও দাম্পত্য প্রেম, এ দুটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ; উভয়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ। এই অযৌক্তিক কথার উত্তর দিতেও ইচ্ছা করে না। একমাত্র উত্তর এই—ঈশ্বরের ইচ্ছা এই,—বাল্যকাল হইতে পিতা মাতার প্রতি সন্তানের অনুরাগ ও ভক্তি জন্মিবে; এবং যৌবনকাল হইতে দাম্পত্য প্রেমের উদয় হইবে। বিধাতার এই ইচ্ছার ইঙ্গিত স্পষ্ট বুঝিতে পারে না, এমন লোক পৃথিবীতে বিরল, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কিছু অধিক বলিতে চাই না। আমরা জয়গোবিন্দ বাবুর সহিত যখন একবাক্যে বলি যে, বিবাহ ঈশ্বরের বিধান; ঈশ্বর যে মিলন সংঘটন করেন, তাহা ভঙ্গ করা যাইতে পারে না, (Marriage is a heaven-ordained relation, that the union is effected by God Himself, that it is in its very nature indissoluble &c.)—তখন একথাও বলি যে, এই বিবাহ শৈশবকালে হইতেই পারে না। এ সম্বন্ধে অনেক যুক্তি আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি; আর প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয় কথা জয়গোবিন্দ বাবু এই বলেন যে, এদেশে বাল্যবিবাহে কি কি অপকার হইয়াছে, তাহার কোন তালিকা নাই। এটা তাঁর কিরূপ যুক্তিযুক্ত কথা? তালিকা থাকুক বা না থাকুক, দোষ ঘটুক আর না ঘটুক, সে পৃথক কথা। বাল্যবিবাহে যখন বিধাতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, তখন একজন খ্রীষ্টধর্ম্ম-বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বিবাহকে প্রশ্রয় দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত? বাল্যবিবাহে শারীরিক অপকার হয় কি না, সে পরের কথা। ধার্ম্মিক সর্ব্বাগ্রে দেখিবেন, বিবাহ ভগবানের আদেশ বা ইঙ্গিতসম্মত হইতেছে কি না। তারপর বিজ্ঞান, তারপর দর্শন। ভগবানের ইঙ্গিত বা আদেশের সহিত দর্শন বিজ্ঞানের অমিল হইতে পারে না। তাঁর ইঙ্গিতে যে বিবাহ হয়, তাহাতেই সুফল ফলে। তাঁর যাতে ইঙ্গিত নাই, তাতেই কুফল ফলিবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানুষের সকল কার্য্যই বিধাতার কার্য্য নয়, সুতরাং সকল বিবাহই যে বিধাতার ইঙ্গিতে হয়, একথা মনে করিতে পারি না। অদ্বৈতবাদী ভিন্ন, কোন দ্বৈতবাদী বা ত্রিত্ববাদীদিগের মধ্যে কেহ মনে করিতে পারেন কি না, তাতেও আমাদের সন্দেহ আছে। তাহা যদি হইত, তবে আর কোন কাজেই দোষ ঘটিত না। সুতরাং যে বিবাহ মনুষ্য দ্বারা সংঘটিত, অর্থাৎ যাহাতে বিধাতার আদেশ নাই, তাহা যে অধর্ম্মের কার্য্য, তাতে আর সংশয় কি? অধর্ম্ম অপেক্ষা, ধার্ম্মিকের পক্ষে আর কোন্ দোষ অধিক? যাতে অধর্ম্ম, তাতেই সকল প্রকার সাংসারিক দোষ প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত। বাস্তবিকও তাই। বাল্য বিবাহে যে সকল অনিষ্ট হইতেছে, তিনি চক্ষু ও বুদ্ধি থাকিতে, অনিষ্টের বিবরণ সংগ্রহ নাই বলিয়াই সে সকল কেমনে অস্বীকার করিবেন, আমরা বুঝি না। দিন রাত্রি চক্ষের সম্মুখে যে সকল বীভৎস ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা দেখিয়াও কে অস্বীকার করিতে পারেন যে, বাল্য বিবাহে অনিষ্ট হয় না? এইরূপ অনিষ্ট দেখিয়া দেখিয়াই, সাধারণত ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকদিগের অধিকাংশ ব্যক্তি বাল্য বিবাহের বিরোধী হইয়াছেন (১)। গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে, বাল্য বিবাহ সম্বন্ধে ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর বড় বড় লোকদিগের মতামতের যে একখানি বিবরণ-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠে জানা যায় যে, অধিকাংশ ব্যক্তিই বাল্য-

(১) "The evils resulting from infant marriage are allowed by all the gentlemen whose opinions are above reviewed." Chief Secretary to the Government of Madras.

বিবাহের বিরুদ্ধে বলিয়াছেন। সেই সকল মতের সারাংশ আমরা নোটে দিলাম। এই পুস্তকখানি আমরা সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহাতেই এ কথা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, বাল্যবিবাহে এদেশের ভয়ানক অনিষ্ট হইতেছে। নচেৎ এত গণ্য মান্য ব্যক্তি কখনই বিরোধী হইতেন না। তারপর ডাক্তারদের কথা। ডাক্তারেরাও বাল্য বিবাহের কুফল পরীক্ষা করিয়াই এক বাক্যে সকলে বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন। ইহাতেই প্রমাণ পাওয়া যায়, বাল্য বিবাহে এদেশে যথেষ্ট অনিষ্ট হইতেছে। বাল্যবিবাহে স্ত্রীশিক্ষার ভয়ানক অনিষ্ট সাধন করিতেছে। বালিকাদের অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ার দরুণ শিক্ষার উৎকর্ষ সাধিত হয় না। এ সম্বন্ধে বোধ হয়, কাহার মতদ্বৈধ নাই। অল্প বয়সে কত বালিকার বিবাহ হয়, এবং এদেশে কত স্ত্রীলোক অশিক্ষিতা, তাহা নোটে দেখুন (১)।

"It is generally admitted that infant marriage and enforced widowhood are productive of evil results." J. Monteath. C. S. Under Secretary to the Government of Bombay.

"The Lieutenant Governor finds, in the replies received, a common acceptance of the view, which independently he himself holds, that more evil than good would be likely to result at the present time from any interference by Government in the Socio-religious questions which are now under consideration." A. P. MacDonnell, Scy. to the Government of Bengal.

"The Lieutenant-Governor and Chief Commissioner are not disposed to underrate the drawbacks of infant marriage." Chief Secretary to Government of North Western Provinces and Oudh.

"The evil of child-marriage is of a still more serious character, when viewed in connection with the second subject treated of, viz, enforced-widowhood." Colonel T. J. Clarke, off. chief Commissioner of Coorg.

(১) In 1881, in the territories administered by the Governments of Madras, Bengal, the North-western Provinces and Oudh, the Punjab, and the Central Provinces, there were found amongst the Hindu (including Sikh and Jain) population.

Girls.	Under ten years of age.	Between ten and fifteen.
Single	17, 902, 743	3, 210, 647
married	1, 588, 656	3, 746, 477
widows.	54, 579.	146, 109.

Records no C. C. XXIII. Page 299.—"It has been stated that if the whole population of all ages be taken, the proportion of illeterate females is as 9,972 in 10,000, the learners being 10 in the same number, and the literate 17. Census Report of Bengal vol I. P. 198.

তারপর একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার যুক্তি। এ যুক্তি সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবু যাহা বলিয়াছেন, জয়গোবিন্দ বাবু তাহাপেক্ষা একটীও নূতন কথা বলিতে পারেন নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন নাই।

তার পরের যুক্তি এই—বাল্যকালে বিবাহ হইলে চরিত্রহীনতা ঘটে না। দেখা যাউক, ইহা কতদূর সত্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এক বাক্যে বাল্য বিবাহের দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা এ স্থলে তুলিব না। উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে বিবাহ দিতে মনুও নিষেধ করিয়াছেন। (১) সুতরাং উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে যে বিবাহ, হিন্দু শাস্ত্রেও তাহা গ্রাহ্য নয়। মনুর কথা হিন্দু সমাজের শিরোধার্য্য। এ সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের অভিমত বিস্তৃতরূপে অষ্টম পরিচ্ছেদে ব্যক্ত করা যাইতেছে। তারপর সুশ্রুত-সংহিতায় "পুরুষের পঞ্চবিংশতি বর্ষ এবং স্ত্রীলোকের ষোড়শ বর্ষ অবধি বয়সই পরস্পর সহবাসের উপযুক্ত কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ উক্তকালে উভয়ের বীজই সম্যক পক্ক ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। ইহার ন্যূন বয়স্ক পুরুষ কিম্বা স্ত্রীর সংযোগে গর্ভ সঞ্চার হইলে তদ্গর্ভজ সন্তান গর্ত্তাশয়েই মৃত হয়। অথবা ভূমিষ্ঠ হইয়াও অধিক কাল জীবিত থাকে না। কিংবা জীবিত থাকিলেও নিতান্ত দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইয়া থাকে। কারণ পূর্ব্বোক্ত বিহিত কালের ন্যূন বয়সে উভয়েরই বীজের সম্যক পরিপকতা বা পরিপুষ্টি সাধিত হয় না। (২)" বালক বালিকাকে অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া সহবাস হইতে বঞ্চিত রাখা যাঁহাদের মত, তাঁহারা একথা কোন মতেই বলিতে পারেন না যে, বাল্য বিবাহে চরিত্রহীনতা ঘটে না। কারণ, অসময়ে দাম্পত্য সুখের চিন্তাকে মনে

---

(১) "I admit that infant-marriage is an evil ; I also admit Manu only enjoined that a girl should be married when she was fit for marriage." &c.—Maxmuller.

(২) "ঊন ষোড়শবর্ষায়াম প্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে।
জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥"

সুশ্রুত সংহিতা।

আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী, প্রথম খণ্ড ৩৫৭ পৃষ্ঠা দেখ, এ সম্বন্ধে বিশেষ অবগত হইতে পারিবে।

স্থান দিয়া ও নূতন আস্বাদনে দীক্ষিত করিয়া, তাহা হইতে দূরে রাখিলে আরো চরিত্রহীনতা ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা; বালকেরা ঘর ছাড়িয়া বাহিরে যাইয়া রিপু চরিতার্থ করে। অথবা বালিকাদিগের দ্বারাই বাসনা চরিতার্থ করে। অসময়ে পড়াশুনার প্রতি তাহাদিগের শৈথিল্য জন্মে;—অসময়ে তাহারা বার্দ্ধক্যে উপস্থিত হয়। ইহাও যদি চরিত্রহীনতা না হয়, তবে আবার কাহাকে চরিত্রহীনতা বলে? তারপর বিধাতার ইঙ্গিত যাঁহারা মানেন, কিন্তু শাস্ত্র যাঁহারা মানেন না, তাঁহারাও যৌবনকালের পূর্ব্বে বিধাতার সে ইঙ্গিতের নিদর্শন দেখিতে পান না।

বাল্য বিবাহের কুফল যে কত, তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করা সোজা কথা নয়। এ সম্বন্ধে বহুদর্শী বিজ্ঞ সিভিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস বসু মহাশয় বহু গবেষণার পর যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকগণ ইহাতেই অনেকটা বুঝিতে পারিবেন।

"বাল্য বিবাহ হেতু, প্রথমে বালিকার বিদ্যালয়ে গমন করা ইত্যাদি রহিত হয়, সুতরাং তাহার মানসিক উন্নতির ব্যাঘাত জন্মে। বিদ্যাভ্যাস ও জ্ঞান লাভের কোন সুবিধা থাকে না বলিয়া তাহার মানসক্ষেত্র অনুৎকর্ষিত থাকিয়া যায়। অল্প বয়সেই বালিকা বিবাহিতা হইয়াছে বলিয়া অবিবাহিতার ন্যায় বাটীর বহির্ভাগে গমন করিতে, বা বিবাহের পূর্ব্বে যেরূপ ক্রীড়া বা অঙ্গচালনা করিতে পারিত, তাহা হইতেও বঞ্চিত হয়; শ্বশুরালয়ে গেলে ত তাহার স্বর পর্য্যন্ত বদ্ধ হইয়া যায়, এবং তাহাকে প্রায় জড় পদার্থের ন্যায় দিনাতিপাত করিতে হয়; এ নিমিত্ত তাহার শারীরিক উন্নতির বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে, সুতরাং অঙ্গ সকল অসম্পূষ্ট, কোমল ও নিস্তেজ থাকিয়া যায়।

বালক বিবাহিত হইলে, অন্যান্য বিবাহিত ও বয়োজ্যেষ্ঠ বালকের সংসর্গে থাকিয়া নানা অযথা বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার মনে নূতন ভাব সকলের সঞ্চার হয়, ও তদ্দ্বারা তাহার মন আকৃষ্ট ও বিমোহিত হইয়া যায়; সুতরাং বিদ্যাভ্যাস ও মানসিক উন্নতির প্রতি বিদ্বেষ জন্মে এবং সে বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। অনেকেই অল্প কালের মধ্যে বিদ্যাভ্যাসে এতদূর উদাসীন হয় যে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া শীঘ্রই পঠদ্দশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, এবং কিছুকাল আলস্যে ক্ষেপণ করিতে করিতে যখন সোপার্জ্জিত ধনের প্রয়োজনীয়তা

বুঝিতে পারে, তখন সুতরাং অর্থোপার্জ্জনের জন্য চেষ্টা পাইতে থাকে। অথচ এদিকে তাহার মানসক্ষেত্র অনুর্ব্বর, শুষ্ক মরুর ন্যায় পড়িয়া থাকে। প্রায় দুই এক বৎসর এইরূপে গত হইলে বালিকা ঋতুমতী হয়। তৎকালে পুষ্পোৎসর্গ নামক এক ভয়ানক কুৎসিৎ আচরণ অনুষ্ঠিত হয়, ও তদুপলক্ষে বালিকা স্ত্রীকে স্বামীসম্ভোগ ও গর্ভধারণের যোগ্যা বিবেচনা করিয়া নানা প্রকার ইঙ্গিতাদি দ্বারায় তাহাকে তৎকার্য্যে রত করা হয়। তদুপলক্ষে বালক স্বামীকেও ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। কোথায় যৌবনের প্রারম্ভে বালক বালিকাকে ইন্দ্রিয়-সংযম শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, না তৎপরিবর্ত্তে যাহাতে তাহাদিগের সেই সমুদয় গুরুতর কার্য্যে মনোবৃত্তি উত্তেজিত হয়, তদ্বিষয়ে সহায়তা করা হইতেছে; সুতরাং সেই নবযৌবনপ্রাপ্ত বালক বালিকা পরস্পরের সহবাসে থাকিয়া অসাময়িক শুক্রক্ষয়, রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় শীঘ্রই তাহাদিগের মস্তিষ্ক, স্নায়ু, পেশী ইত্যাদির দৌর্ব্বল্য জন্মে, এবং মস্তক-ঘূর্ণন, শ্লথতা ও অকর্ম্মণ্যতা উপস্থিত হয়।

যে যন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সেই যন্ত্রের দিকে অধিক শোণিত ধাবিত হয় ও সেই যন্ত্রের পরিপোষণের নিমিত্ত অধিক তেজ ব্যয়িত হয়। অসময়ে জননেন্দ্রিয় সমূহের কার্য্য আরম্ভ হইলে অধিক পরিমাণে শোণিত তথায় উপস্থিত হয় ও তজ্জন্য অধিক তেজ ব্যয়িত হইলে কাজেই মস্তিষ্ক ও অন্যান্য যন্ত্র যথাবিধানে পরিপুষ্ট হইতে পারে না; উহারাও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আরও দেখা যাইতেছে, স্নায়ব তেজ অত্যন্ত অধিক ব্যয়িত হওয়ায় অন্যান্য অঙ্গ যথাবিধানে চালনা করিতে প্রবৃত্তি থাকে না, আলস্য জন্মে, এবং অঙ্গচালনা না হওয়াতে কাজেই পেশীসকল সুদৃঢ় হইতে পারে না। ফলতঃ ইহা হইতে সমস্ত শরীর অকালে যৌবন প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু আকার, গঠন ও বিধান সকল খর্ব্ব, অসম্পূর্ণ ও অনুন্নত থাকিয়া যায়। এ দিকে বালিকা ভার্য্যার জননেন্দ্রিয়ে রক্তাধিক্য হওয়াতে সে ঋতুমতী হয় বটে, কিন্তু তাহার অন্যান্য যন্ত্রের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। তাহার মস্তিষ্কে শোণিতের অল্পতা হেতু মস্তক ঘূর্ণন, অনিদ্রা, বা অতি নিদ্রা ও আলস্য উপস্থিত হয়। একেত বিবাহিতা হইয়াছে, এজন্য তাহার বয়সোচিত ক্রীড়া ও অঙ্গচালনা নিরুদ্ধ থাকায় এবং একটী যন্ত্রের অসাময়িক উৎকর্ষ হেতু মস্তিষ্ক, স্নায়ু, পেশীসকল অপরিপুষ্ট থাকে, সুতরাং তাহাদিগের

কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মে। দেহের নিম্নভাগে অধিক শোণিত আকৃষ্ট হওয়ায় কতক পরিমাণে আয়তন বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হওয়ার নিমিত্ত উহার বাস্তবিক সুদৃঢ়তা জন্মে না ঐ সমস্ত অস্থি পেশী ইত্যাদি কোমল থাকে এবং অনেক সময় অপ্রশস্তও থাকে। ইহার পর প্রায় এক বৎসর পরে ঐ বালিকার (হয়ত তাহার বয়স ১৩। ১৪ বৎসর মাত্র) গর্ভসঞ্চার হয়। তৎকালে গর্ভাবস্থাজনিত পীড়া সমুদয়ের জ্বালা, যন্ত্রণা সহ্য করিয়া পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, প্রসবকালে তাহাকে যেরূপ কষ্টভোগ করিতে হয়, তাহা কে না অবগত আছেন, তাহার কঙ্কাল পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হয় নাই; স্থান সকল সমুচিত সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই, সুতরাং অসহ্য কষ্ট উপস্থিত হয়। অনেক সময় এজন্য অস্ত্রচিকিৎসার আবশ্যক হয়। ঐরূপ অবস্থায় কতকগুলি বালিকা অকালে প্রাণত্যাগ করে, কাহারও বা প্রসবের অন্য উপায় না থাকাতে উদর কর্ত্তন করিয়া শিশুর প্রাণ রক্ষা করিতে হয়। কি ভয়ানক দুর্ঘটনা! যদিই ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে নিরাপদে প্রসব হইল, সেই বালিকা-মাতা শিশুপালনের কি জানে? নবপ্রসূত সন্তানের মুখ দর্শন করিয়া আনন্দানুভব করিল বটে, কিন্তু তাহার প্রতিপালনের ভার লইতে সে সমর্থ হইল না। সূতিকাগারের কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ, রাত্রি জাগরণ, স্তন্য-পান করান এ সমুদয় কার্য্য কি ১৪। ১৫ বৎসরের বালিকার সাধ্য? অতি শীঘ্রই সে বালিকার আকার প্রকার দর্শনে বোধ হয় সে ভারগ্রস্ত হইয়াছে, এই অবধি সেই বালিকা-জননী স্বীয় স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে অক্ষম হইয়াছে; অনেকানেক মাতার ঐ সময় হইতে অপরিপুষ্ট দেহ হেতু উদরাময়, কাশ ইত্যাদি রোগের সঞ্চার হয়। তদুপরি পুনরায় পূর্ব্বোল্লিখিত সমুদয় ঘটনা চলিতে থাকায়, দিন দিন বালিকার শরীর শীর্ণ, দুর্ব্বল, ক্ষীণ ও বিবর্ণ হইয়া পড়ে এবং অকালে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে ডাক্তার বার্ণসের মত নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(ক) বাল্যে পরিণীত দম্পত্তির আকার খর্ব্ব হয়। বাল্যে ঋতুমতী হইলে নারীর আকার খর্ব্ব হয়।—(বার্ণস্।)

(খ) অসাময়িক ঋতু হওয়াতে কতকগুলি বালিকার দুর্ব্বলতা ও মৃত্যুও হইয়াছে, কিন্তু ইহাই নিয়ম নহে।—(বার্ণস্।)

(গ) অনেক স্থলে অতি অল্প বয়সে, এবং বাল্য পরিণয় দ্বারা আদ্য-[illegible] হয়, তাহার সন্দেহ নাই; জরায়ু ভ্রূণকে ধারণ করিবার উপযুক্ত

পূর্ণতা লাভ করিবার পূর্ব্বে গর্ভাধান হয় এবং ঐ সকল স্থানে গর্ভনাশই সচরাচর ঘটিয়া থাকে।—(বাণস্।) এদেশেও তাহাই ঘটে।

(ঘ) বাল্যপরিণীত দম্পতির অকাল-বার্দ্ধক্য ঘটে, ইহার কোন প্রমাণ আবশ্যক করে না। উহাদিগের জীবনের সমস্ত কার্য্য অকালে আরম্ভ হইয়া অকালেই সমাপ্ত হয়, সুতরাং কোন যন্ত্রের কার্য্যই সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে না। বৃক্ষলতাদির মধ্যে এ নিয়ম অতি সুন্দররূপে লক্ষিত হইয়া থাকে।

সুতরাং বালিকা বিবাহ হেতু এদেশীয় স্ত্রীগণের শারীরিক ও মানসিক নানা প্রকার অসুস্থতা উৎপন্ন হয়, স্বীকার করিতে হইবে। অপরন্তু শীঘ্র শীঘ্র পরিবার বৃদ্ধি হওয়ায়, নবযৌবন-প্রাপ্ত বালকের মনে শান্তি থাকিতে পারে না, এবং সমুচিত অর্থাগম না হইলে পরিবারের ভরণপোষণের ব্যাঘাত জন্মে; সেই চিন্তাই তাহার মনকে দিবানিশি অশান্ত করে এবং অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত তাহাকে সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিতে হয়। অবস্থা বিশেষে অযথোচিত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিয়া শরীর ও মন রুগ্ন করিয়া ফেলে। এইরূপে দেখা যায় যে, দম্পতির শারীরিক ও মানসিক অনুন্নতি, খর্ব্বতা, দৌর্ব্বল্য ও রোগ বাল্যবিবাহের অবশ্যম্ভাবী ফল। আরও দেখা যায় যে, সেই হীনবল, নিস্তেজ ও নিশ্চেষ্টমনা শিশু বয়স্থ হইয়া সমাজের কোনই উপকার করিতে পারে না। আপনার ও পরিবারের জীবন রক্ষার উপায় অবলম্বন করিতেই তাহার সময় কুলায় না; সে ব্যক্তি আবার কখন্ আপনার দেশের উন্নতির চেষ্টা করিবে এবং তাহার মন সমাজের উপকারের নিমিত্ত কখন্ সময় পাইবে? পরিবার প্রতিপালনের সংস্থান হইবার পূর্ব্বে বিবাহ করিলেই এই বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে।

এক্ষণে অপরিপুষ্ট, খর্ব্বকায়, হীনবল, নিস্তেজ ও নিশ্চেষ্ট পিতা মাতার সন্তান কেন সুস্থ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু হইতে পারিবে না, তাহা তাহাদিগের সন্তান সন্ততির বিষয় আলোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধ হইবে। অপরিপক্ক বীজ হইতে কখন সতেজ বৃক্ষ জন্মে না। অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে কি প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়? সুন্দর, সুস্বাদু, সুমিষ্ট ও সুবৃহৎ ফল কিরূপ বৃক্ষে জন্মে? বীজ যথাবিধানে ও যথাকালে উপযুক্ত উর্ব্বর ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া নিয়মিত সময়ে অঙ্কুরিত হইলে, নিয়মিত রূপে জলসেচন দ্বারা ও সূর্য্যের উত্তাপ ও নির্ম্মল বায়ু উপভোগ করিয়া কীট পতঙ্গাদির আক্রমণ

হইতে যে বৃক্ষ সুরক্ষিত হইয়াছে এবং উচিত সময়ে পুষ্প হইলে, যাহার অতিরিক্ত পুষ্প শুষ্ক ও বিনষ্ট হইয়া গিয়া কেবল বয়সোচিত ফল মাত্র থাকে, সেই বৃক্ষেই ঐরূপ সুফল জন্মে।

খাদ্য বিষয়ক প্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এদেশীয় পুরুষ খর্ব্বাকৃতি; অধিকাংশ ব্যক্তিই ৫ ফুট ৪ ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ নহে; ইউরোপীয় মধ্যমাকার পুরুষ ৫ হইতে ৭ ইঞ্চি, এবং এদেশীয় সাধারণ ব্যক্তির দেহভার কেবল ১ হইতে ৫ সের মাত্র, আর ইউরোপীয় মধ্যমাকার পুরুষের দেহ ভার ১৮৫ সের। অথচ দেখুন, ঈশ্বরের নিয়মানুসারে যত বৃহদাকার জন্তু আছে, সে সমস্তই উষ্ণপ্রধান দেশের অধিবাসী, যত বিশাল বৃক্ষ সে সমুদয়ই উষ্ণ প্রধান দেশের উদ্ভিদ; কেবল এক মনুষ্য এবং তৎসঙ্গে পালিত পশু, যথা—গো, অশ্ব, ছাগ প্রভৃতিই এদেশে খর্ব্বাকৃতি। এদেশে যাহারা স্বাভাবিক নিয়মে চলে তাহারা সচ্ছন্দ, সবল, দীর্ঘাকার ও দীর্ঘায়ু হয়, এবং মনুষ্য ও মনুষ্যের পালিত পশুদিগের দুর্গতির কারণ এই যে, এদেশের লোকেরা এখনও স্বাস্থ্যজনক উপায় অবলম্বন করিতে শিক্ষা করে নাই ও জানে না।

অতএব দম্পতির শরীর ও মন যেরূপ অসম্পূর্ণ ও অনুন্নত থাকিতে থাকিতে সন্তান জন্মে, তাহাদের সন্তান সন্ততিও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সেইরূপ অসম্পুষ্ট, খর্ব্ব-দেহ, দুর্ব্বল ও অল্পায়ু না হইয়া থাকিতে পারে না।' পূর্ব্বকালে কেবল বালিকাদিগেরই অল্প বয়সে বিবাহ হইত ও তাহার অনিষ্টকর ফলও ফলিত; এক্ষণে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের অল্প বয়সে বিবাহ হয়, সুতরাং এক্ষণে চতুর্গুণ অনিষ্টকর ফল ফলিতেছে। পূর্ব্বে উপযুক্ত বয়সে পুরুষের বিবাহ হইত, সুতরাং তাহাদিগের শরীর ও মন উন্নত ও সমৃদ্ধ হইত এবং তাহাদিগের সন্তানেরাও অপেক্ষাকৃত সুপক্ ও পরিপুষ্ট হইত। এক্ষণে পুরুষের শারীরিক ও মানসিক অবনতি হয় ও তাহাদিগের ঔরসজাত সন্তানগণ তদনুক্রমে হীনবীর্য্য ও অল্পায়ু হয়। এ বিষয়ে আর অধিক বলা অনাবশ্যক; পাঠক মহাশয় মনে করিয়া দেখুন, তাঁহার পরিচিত কত হিন্দু মাতার প্রথম গর্ভ নষ্ট হইয়াছে; কত মাতার প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া অকালে মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়াছে; এবং কত দম্পতির প্রায় অর্দ্ধেকগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বোধ হয় গড়ে শতকরা ৬৫—৪৫টি সন্তান ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়।

এতদ্ব্যতীত গুরুতর ও অধিকতর শোচনীয় ঘটনা সকল বাল্যবিবাহ হইতে উৎপন্ন হইতেছে। গত বৎসর (১৮৮১) একটী ৯।১০ বর্ষীয়া বিবাহিতা বালিকা মূর্খ পশুবৎ পতির হস্তে পতিত হইয়া রমণক্রিয়ায় প্রলুব্ধ হয় এবং অতিরিক্ত শোণিত ক্ষয় হওয়াতে ৬ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করে। কয়েক মাস পূর্ব্বে অপর একটী দশম বর্ষীয়া বালিকা মূর্খ স্বামীর পশুবৎ আচরণ কালে চীৎকার করিয়াছিল, এজন্য সেই কামান্ধ স্বামী ঐ নিরাশ্রয় বালিকার গলা চাপিয়া ধরে এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। কখন কখন কামান্ধ স্বামী ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার নিমিত্ত বালিকা স্ত্রীর জননেন্দ্রিয় নানা প্রকারে ক্ষতবিক্ষত করিয়া থাকে, তাহাও জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। বাল্য-বিবাহই কেবল এই সমুদয় ভয়ানক শোচনীয় ঘটনার একমাত্র কারণ, মূর্খতা উহার সহায়তা করে।"

এতভিন্ন অন্যান্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের মত আলোচনা করিলে বাল্যবিবাহে কত অনিষ্টের কথা স্মরণ হয়। সুশ্রুত সংহিতা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান একবাক্যে বাল্যবিবাহের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন (১)। রাশি রাশি

(১) আয়ুর্ব্বেদ সঞ্জীবনী প্রথম খণ্ড, ৩৫৭ ও ৩৫৮ পৃষ্ঠা দেখ, সবিশেষ অবগত হইতে পারিবে।

ডাক্তার ধর্ম্মদাস বাবুর কথাকে যাঁহারা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবেন, তাঁহারা দেখুন,' ঋতু বিকাশের পূর্ব্বে বিবাহের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞ ডাক্তারগণ কত তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।

"Dr. J. Fayrer M. D., বলেন "The fact of a girl having attained the period of puberty does not by any means imply that, though *capable* she is *fit* for marriage. Physiological science, common sense, and observation all teach that an immature mother is likely to produce weak and imperfect offspring." Dr. Chevers M. D., বলেন "If safe childbearing and healthy offspring are to be regarded as being among the first objects of marriage, the rite ought seldom to be allowed before the 18th, the 16th year being the minimum age in exceptional cases." Dr. Charles, M. D., বলেন "The begining of menstruation should not be taken to represent the marriageable age. It is true that taking generally this may be said to be sign that a girl has arrived at the age at which she *may* concieve. I believe that though this event may be taken to represent commencing puberty, a girl ought not to be taken as having arrived at puberty till various changes in her organisation, which take place gradually and occupy a considerable period, have been fully completed." Dr. A. V. White,

সম্ভাবনা যে বাল্যবিবাহে, এবং শাস্ত্রেও যাহা নিষিদ্ধ, তাহাতে চরিত্রহীনতা ঘটিবে না, এ কি রূপ কথা? চরিত্রহীনতা কাহাকে বলে? সে সময়ের যে

M. D., বলেন "Menstruation is no doubt the most important sign of puberty, but when it shows itself early it is the only sign of commencing puberty, and in the absense of other indications, by no means imply that a girl is fitted for marriage or child bearing. It is not until puberty has been fully established that the minimum marriageable age has been reached and this rarely occurs, in my opinion, among Native girls before the 15th or 16th year; but if marriage were delayed until the 18th year, the frame would be more thoroughly developed, the danger of child bearing would be lessened, and healthier offspring would be secured". Dr. M. L. Sarkar, M. D., বলেন "The commencement of the menstrual function is no doubt an index to the *commencement* of puberty. But it is a grave mistake to suppose that the female who has begun to menstruate is capable of giving birth to healthy children."

বোম্বের Dr. Atmaram Pandurung বলেন "Puberty is not the best criterion of marriageable age, for it is not the period at which development of parts concerned in gestation and delivery is completed; nor is the mind well adapted for the requirements of the mother in taking proper care of her delicate and tender offspring".

Dr. Charles বাল্যবিবাহের অপকারিতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে গিয়া বলিতেছেন, "I may state my belief that probably the injurious effect of early child-bearing would be more apparent from Indian statistics."

বালিকার বিবাহের বয়সের বিষয়ে Dr. Smith M. D. সুস্পষ্টরূপে বলিতেছেন:—"Before the age of sixteen a female cannot be said to be fully developed—either physiologically or mentally. Some parts of her osseous structure which are essential to the reproductive function, are net yet consolidated." ইহাতে প্রমাণ হইল যে, ষোড়শ বৎসর বয়সেও স্ত্রীলোকের গঠন পূর্ণ হয় না। Dr. J. Ewart, M.D., বলেন—"I am of opinion, that the minimum age at which Hindu women should be encouraged to marry, would be after and not before the sixteenth year. But the race would be improved still more by postponing the marriage of women till the eighteenth or nineteenth years of age." Dr. Fayrer বলেন—"I consider that the minimum age at which Native girls should be married is 16 years and I think it would be well, as a general rule, that marriage should be deferred to a later period, say to 18 or 20 years of age." ডাক্তার তামিজ খাঁ বলেন—"In considering the proper age for marriage for a native girl of India, *we should not look* to the time when the signs of puberty show themselves generally, but make it a point *that under no circumstances a girl is to be allowed to get married before she has attained the full age of sixteen at the least*; nor can there be entertained any doubt that were the consummation of marriage rites deferred some-

কর্ত্তব্য, সে সময়ে তাহা পালন না করিলেই চরিত্রহীনতা ঘটে। বাল্যকালে বিবাহ না করাই যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে তাতে চরিত্রহীনতা নিবারণ করিবে

what longer, it will tend to the improvement of the individual and the progeny too." Dr. Atmaram Pandurung বলেন—"If the question had been simply what is considered to be the proper age at which girls ought to marry the proper answer would be, without hesitation, 20 years and there are sound anatomical and statistical reasons. When girls marry at that age all the end and aim of marriage are gained with the best of results. There is then less amount of sterility and also less number of deaths of mothers at their delivery. &c. ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ বসু বলেন—"Our girls should not be married before they have attained at least, the eighteenth year of their age. Before this period it would not bear with impunity the drain which maternity must establish in it."

এ বিষয়ে পণ্ডিতপ্রবর Herbert Spencer বলেন,—"It is shown by the tables of Dr. Duncen's works that the fecundity of women increases up to the age of about 25 years ; and continuing high with but slight diminution to after the 30th and then gradually wanes. Infants born of women from 25 to 29 years of age are both longer and heavier than infants born of younger or older women * * There is the fact that a too early bearing of young produces on a woman the same injurious effects as on an inferior creature—an arrests of growth and enfeeblement of constitution."

অনেকের ধারণা আছে যে, আমাদের দেশ গরম বলিয়া বাল্যকালেই ঋতু হয়, ডাক্তারেরা এ সম্বন্ধে কি বলেন, শুনুন ;—

Dr. Charles বলেন :—"The great cause which induces early menstruation (in India) is undoubtedly early marriage. The girl is forced into menstruating prematurely by the abnormal conditions under which marriage places her. * * I believe, in the young widow and in the girl kept seperate from her husband, menstruation occurs uniformly later than in those living in a state of marriage. I am also of opinion that the universality of early marriage has had a decided effect in determining the earlier appearance of menstruation." ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার বলেন :—"The advocates of early marriage urge that the custom is nothing else than the expression of a stubborn necessity which has arisen from the fact of early pubescence in this country. I think, however, we are warranted * * in concluding that early marriages have been the cause of early pubescence." Dr. Atmaram Pandurung বলেন :—"The custom of premature marriage thereby acting injuriously upon the morals of the people among whom it prevails, has an undoubted tendency to bring on early puberty, and this strangely mistaken for climatic influence." Dr. A. V. White বলেন :—Early marriages as they obtain in this country

কিরূপে? বরং তাতে আরো চরিত্রহীন করে। বাস্তবিক, বাল্যকালে বিবাহ হইলে, বালক বালিকারা অসময়ে পরিপক্ক হয়, জ্যেষ্ঠতাতত্ত্বে দীক্ষিত

(India) have the effect of prematurely rousing the ovaries into a state of activity and early menstruation is the result." ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ বসু বলেন:—"When the practice (early marriage) becomes a marked one, it tends to perpetuate itself by producing precocious maturity among the children in accordance with the organic laws which govern the heriditary transmission of physical and mental qualities."

এতদ্বারা সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল যে, আমাদের দেশে অন্যান্য দেশাপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ঋতু উপস্থিত হওয়ার যদি একমাত্র কারণ না হয়, অন্ততঃ সর্ব্বপ্রধান কারণ বাল্যবিবাহ। এখন দেখা যাউক, উষ্ণতা কি পরিমাণে ঋতু-উপস্থিতির সহায়তা করে:—এ বিষয়ে Dr. Chevers বলেন:—"The general opinion among physiologists is that, all collateral circumstances except those of climate being equal, all women would reach puberty at about the same age." ইহার মর্ম্ম এই যে, উষ্ণতার তারতম্যে ঋতুকালকে অগ্রপশ্চাৎ করিবার বিশেষ কোন ক্ষমতা নাই। Dr. Charles বলেন:—"Two points, however, constituting grave and formidable impediments have come prominently before me while making enquiries to enable me to offer an opinion on the question (of early marriage). One lies in a widespread belief that the climate leads to early menstruation, which points to early marriage, and the other a similarly extended opinion that the climate causes an early development of several passion. There is just sufficient truth in both these statements to render it impossible to give them a full and unreserved denial, yet so little truth in them as to render the arguments based on them entirely valueless." (আমাদের দেশে অসময়ে ঋতু আবির্ভাবের কারণ ইনি যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা উপরে দেখান গিয়াছে।) ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার বলেন,—"A superficial view of available facts would seem to incline the mind to the belief that climate does influence the menstrual function, delaying its first appearance in the cold and hastening the period in tropical countries. After carefully weighing all the circumstances which might have a possible influence on the function I am led to believe that if climate has any influence, it is trifling, not to say infinitesimal. Dr. Atmaram Pandurung বলেন,—"Climate has no influence in the matter." Dr. White ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের বালিকাগণের ঋতু তুলনা করিয়া বলেন,—"The cause of this difference of two years is not so such in my opinion the effect of climate, as difference in the constitution of the two races.".

অবস্থা, শিক্ষা ও জীবন যাপন প্রণালী পরিবর্ত্তন দ্বারা যে ঋতুকালকে পশ্চাৎ করা যায়, এবং তাহা দ্বারা যে শরীরের কোনপ্রকার অনিষ্ট না হইয়া বরং অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে আমরা Dr. Peters এর পুস্তক হইতে তাঁহার মত সঙ্কলন করিয়া দেখাইব। তিনি বলিতেছেন,—"It is satisfactorily established that in every country and climate the period of first menstruation may be retarded in very many cases much

হয়, অসময়ে রিপু চালনা করিয়া নীতিহীন ও চরিত্রহীন হয়। এ সকল কিছু নূতন কথা নয়। সুতরাং বাল্যকালে বিবাহ হইলেই চরিত্রহীনতা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। কেন না, বাল্যবিবাহই এ দেশের বালবিধবার সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ। বালবিধবাদের মধ্যে যে কত জন চরিত্রহীন হইয়া কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, জয়গোবিন্দ বাবু একবার তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? অন্যদিকে বাল্যকালে বিবাহিত এ দেশের কত পুরুষ যে বেশ্যাশক্ত ও চরিত্রহীন, তাহা জানেন কি? কল্পনার চক্ষে সত্য দেখা সোজা কথা, কিন্তু ঘটনা তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

তারপর নয় মনে কর, বাল্যকালে বিবাহ হইলে চরিত্রহীনতা না জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। তাতেই বা কি? যে বাল্যবিবাহে শত শত অনিষ্ট, তাহা দ্বারা চরিত্র রাখা কি উচিত? একটা অন্যায় দ্বারা একটা ন্যায়কেও রক্ষা করা উচিত নয়। একটা অনিষ্ট নিবারণের জন্য বালক বালিকাকে চিরকালের জন্য রোগের অধীন, শোকের অধীন, চিন্তাবিহীন, জ্ঞানবিহীন করিয়া রাখা কি উচিত? অকাল মৃত্যু-মুখে ফেলা কি উচিত? বাল্যবিবাহে অনেক রোগ জন্মে, অসময়ে পুত্রশোক পাইতে হয়, বিদ্যাশিক্ষায় শিথিলতা জন্মে, এ সকল অতি পুরাতন কথা। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। অন্যান্য পত্রিকায় ও পুস্তকে এ সকল কথার যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। অনিষ্ট নিবারণের জন্য অনিষ্ট ডাকিয়া আনিতে পরামর্শ দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয়।

তারপর তিনি বলেন, বাল্যকালে বিবাহ না দিলে পাত্র জুটিবে না। এটা কোন কাজেরই কথা নয়। সকল বালিকাই যদি উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে, তবে পাত্র জুটিবে না কেন, বুঝি না।

---

beyond the average age often without producing illness or the slight inconvenience. Tilt even goes so far, as assume, the great art of managing girls so as to bring them to the full perfection of womanhood, is to retard the period of puberty as much as possible." শরীর মনের পরিচালনা বৃদ্ধি সহকারে মানবের জননশক্তি হ্রাস হইয়া আইসে ও তাহার অবান্তর ফল ব্যক্তিগত উন্নতি। Herbert Spencer বলেন :—"In proportion as activities increase, in proportion as, by its more and more complex, rapid and vigorous actions an animal gains power to support itself and to cope with surrounding dangers it must lose power to propagate." স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বালিকাগণের অকালে বিবাহ না দিয়া যাহাতে তাহাদের শরীর মনের পরিচালনা দ্বারা ঋতুকাল পশ্চাৎ করিয়া তাহাদের মনের পুষ্টিসাধন হয়, তাহা করা পিতা মাতেরই কর্ত্তব্য। নব্যভারত, আষাঢ় ১২৯৩।

বিবাহের যোগ্য মেয়ের সংখ্যা এদেশে বেশী নয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সসে পুরুষের সংখ্যা ৩১,৩৪১,৩৬৬, রমণীর সংখ্যা ৩১,৩৬৪,৩৫২ ছিল, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের গণনায় পুরুষের সংখ্যা ৩৪,৬২৫,৫৯১ ও রমণীর সংখ্যা ৩৪,৯১১,২৭০ জন (১)। এ সংখ্যাতে যদিও রমণীর সংখ্যা কিছু অধিক দেখা যায়, কিন্তু ইহার এক পঞ্চমাংশ বিধবা (২)। বিধবা-বিবাহ সমাজে প্রচলিত নাই, এবং পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত। কোন কোন স্থলে একজন কুলীন ব্রাহ্মণকে ১০০ কি ১৫০টী পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে দেখা যায়। সুতরাং মোটের উপর বিবাহের যোগ্য মেয়ের সংখ্যা, বিলাতের ন্যায়, বিবাহের উপযুক্ত পাত্র অপেক্ষা অধিক নয়। সুতরাং পাত্রের অভাব হইবে কেন, বুঝি না। এখন যে পাত্রের পণ লাগে, সে কেবল বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে বলিয়া। অধিক বয়স পর্য্যন্ত কন্যা ঘরে রাখিতে পারিলে, পাত্রই শেষে যৌবনের উত্তেজনায় বিবাহের জন্য লালায়িত হইবে। পাত্র পাত্রীর উপযুক্ত বয়স হইলে, এবং তাহাদের কতক স্বাধীনতা জন্মিলে বিবাহের পণের হ্রাস হইতে পারে। শিক্ষাপ্রাপ্ত বর, কখনই উপযুক্ত পাত্রীর জন্য টাকা লইতে ইচ্ছুক হইতে পারেন না। কন্যা-বিক্রয়ের কুপ্রথা নিবারণের পথে যৌবন বিবাহই একমাত্র কার্য্যকারী শক্তি। এই কুপ্রথা হিন্দু সমাজের সর্ব্বনাশ করিয়া ফিরিতেছে;—কত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতা কঠোর চিন্তায় জীর্ণ শীর্ণ হইতেছেন, কত জন অকালবার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন, কত জন বা একেবারে দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন। আর এপ্রথাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। বাল্যকালে বর কন্যাকে বাধ্য হইয়া অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়াই এই পণ লওয়ার কুপ্রথা নিবারিত হইতেছে না। পাত্র যদি আপনাকে ভরণ পোষণ করিতে সক্ষম হন, তবে আর স্বার্থপর অভিভাবক এ কুপ্রথা রাখিতে পারিবে না। এই কুপ্রথা নিবারণের জন্যও যৌবনবিবাহ একান্ত প্রয়োজন।

আর একটী কথা। এদেশে যত মেয়ে দুশ্চরিত্রা হয়, তন্মধ্যে অধিকাংশই বালবিধবা। প্রকৃতির অপরিহার্য্য বিধানের হাত এড়াইতে না পারিয়াই তাহারা এইরূপ হয়। বাল্যবিবাহ নিবারিত হইলে বালবিধবার সংখ্যা

(১) Census Report of Bengal, 1881, Vol I, P. 41.

(২) see Selections from the Records of the Government of India No. CCXXIII P. 299.

কাজেই হ্রাস হইবে। এদেশে কত ভদ্রলোকের বিধবা মেয়ে যে কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহার সংখ্যা নাই। এই অসচ্চরিত্রতা নিবারণের জন্যও বাল্যবিবাহ রহিত করা উচিত। তাহাদের পুনর্বিবাহ হইলেও ইহা নিবারিত হইতে পারে। এই দুই উপায়ের একটী উপায় অবলম্বিত না হইলে চিরকাল তাহারা ভাল থাকিবে, কখনই আশা করা যায় না। বাস্তবিক তাহা থাকেও না।

কিন্তু এস্থলে কথা হইতেছে, যৌবন বিবাহেও অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। কথা সত্য, কিন্তু যুবতী মেয়েদের আশা থাকে, সচ্চরিত্র থাকিলে দু দশ দিন পরেই বিবাহ হইবে। কিন্তু বালবিধবাদের সেরূপ কোন আশা নাই। নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়াই তাহারা কুলধর্ম্ম ত্যাগ করে। ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হইলে, যৌবন বিবাহে অনিষ্ট হইবে না, আশা করা যায়; কিন্তু ধর্ম্ম-জ্ঞান হইলেও বালবিধবাদের চরিত্র বজায় রাখা অপেক্ষাকৃত কঠিন। ইয়ুরোপ এবং অন্যান্য যে সকল প্রদেশে যৌবন বিবাহে কুফল ফলিতেছে, ধর্ম্মহীনতাই সে সকল স্থলে প্রধান কারণ, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এজন্য মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি? যাহাতে লোক ধার্ম্মিক হয়, জীতেন্দ্রিয় হয়, ইহাই কর্ত্তব্য। আগুনে বাড়ী ঘর পুড়িয়া যায় বলিয়া আগুনের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা কি উচিত? যাহাতে বাড়ী ঘর না পুড়ে, বরং তাহাই করা উচিত। রিপুর অত্যাচারে মানুষ ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় বলিয়া, অঙ্গ বিশেষ কর্ত্তন করিতে কোন ক্রমেই ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে না। সাবধান হওয়া উচিত, এই পর্য্যন্ত বলা যায়। বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকাতে এদেশে চরিত্রহীনতার কতরূপ প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে কয়জন লোক চিন্তা করেন? আমরা জানি, অনেক স্থলে অভিভাবকের অভিমতে বালবিধবারা কুলধর্ম্ম ত্যাগ করে! অন্য দিকে আমরা এই ব্রাহ্মসমাজের অল্পদিনের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি, বাস্তবিক খুব সতর্ক না হইলে যৌবনবিবাহেও পদে পদে বিপদের আশঙ্কা আছে। কিন্তু সে উভয় প্রথা সম্বন্ধেই সতর্কতা অবলম্বন করা ভিন্ন আর উপায় দেখা যায় না। ধর্ম্মের বিশুদ্ধ বায়ু যাহাতে দেশ মধ্যে প্রবাহিত হয়, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহার চেষ্টা করা উচিত।

তারপর বাল্য বিবাহের পোষকতায় জয়গোবিন্দ বাবু আর যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাতে না আছে যুক্তি, না আছে তর্ক, না আছে চিন্তা-

শীলতা। সে সকল কথা সম্বন্ধে আর আলোচনা করিব না। তবে তিনি যে উদ্দেশ্যে এই সকল কথা বলিয়াছেন, সে উদ্দেশ্যে অতি মহৎ। সে উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের প্রাণের গভীর সহানুভূতি আছে। এ সম্বন্ধে তিনি যে চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি। হিন্দু সমাজের বিরোধী ব্যক্তি এরূপ নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের উপকারের চেষ্টা করিয়াছেন, ভাবিলেও আনন্দ হয়। ঈশ্বর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন। কি কি কারণে বিবাহ-ভঙ্গপ্রথা সমাজে চলা উচিত নয়, এ সম্বন্ধে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা অনেক স্থলেই যুক্তিযুক্ত। তাহার সে সকল কথার সহিত আমাদের মতের বড় অনৈক্য নাই। ১৩।১৪ বৎসরের বালিকা বা ১৮।২০ বৎসরের বালকের সম্মতি বা অসম্মতির যে কোন একটা মূল্য নাই, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে তাঁর সহিত এক বাক্যে বলি, এরূপ বিবাহ-ভঙ্গ-প্রথায় মত দেওয়া কাহারও পক্ষে উচিত নয়।

শোভাবাজার রাজবাড়ীতে বাবু জয়গোবিন্দ সোম ভিন্ন আর যে সকল বড় বড় লোক বাল্যবিবাহের পক্ষে মত দিয়াছেন, তন্মধ্যে বাবু চন্দ্রনাথ বসু, বাবু অক্ষয়কুমার সরকার, বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু মনমোহন বসু, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নামই দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রনাথ বাবুর পূর্ব্ব-প্রকাশিত মতের আমরা যথাসাধ্য উত্তর দিয়াছি। এ সভায় তিনি আর কোন বিশেষ নূতন কথা বলেন নাই। অক্ষয়বাবু বলেন,—"পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশে বাল্য-বিবাহ থাকা সত্ত্বেও সেখানকার লোক দুর্ব্বল নয় কেন?" উত্তর এই—সে সমস্ত দেশের জল বায়ু ভাল। বাল্যবিবাহ প্রচলিত না থাকিলে সে দেশের লোকেরা আরো সবল হইত। জল বায়ু যে স্বাস্থ্যের একটী কারণ, কেহ কখনও এ কথা অস্বীকার করে নাই। বাঙ্গলার ছাগ ইত্যাদির দৌর্ব্বল্যের কারণও আবহাওয়া। একেত বাঙ্গলার আবহাওয়া খারাপ, তার সঙ্গে বাল্যবিবাহ জুটিয়া আরও অনিষ্ট করিতেছে। বাঙ্গলার গোপ, বাগ্‌দি, ও ডোমদিগের স্বাস্থ্যের বিষয় তিনি যে উল্লেখ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বক্তব্য এই, শারীরিক পরিশ্রম হেতু তাহারা সবল। বাল্যবিবাহ প্রচলিত না থাকিলে তাহারা আরও সবল হইত। এ কথার উত্তরে অক্ষয়বাবু কি

কিছু বলিতে পারেন ? তার পর তিনি কন্যা বিক্রয়ের কুপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতার উপসংহার করিয়াছেন।

ইন্দ্রনাথ বাবু একটু রঙ্গরস করিয়া তারপর বলেন—"বাল্যবিবাহেই তিনি ও তাঁহার পত্নী সুখী হইয়াছেন।" সে ত ভালই, কিন্তু তাহাতে কি প্রমাণ হইল ? এক জন সুখী বা সবল থাকিলেই যে সকলে থাকিবে, তাহা কি প্রমাণিত হয় ? কন্যা পছন্দ করিতে মেয়ের বাজার বসাইতে হইবে কি, ইত্যাদি নানা অসংলগ্ন কথা বলিয়া তিনি বক্তৃতা শেষ করিয়াছেন।

বাবু মনমোহন বসু নানা কথার পর বলেন,—"ভীষ্মাদি, কর্ণ, দ্রোণ আদি ও পঞ্জাবী মহারাষ্ট্রীরা বাল্যবিবাহের ফল। বাঙ্গালীর দৌর্ব্বল্য অনেক কারণে"। বেশ কথা। কিন্তু ডাক্তারেরা বলেন, বাল্যবিবাহও দৌর্ব্বল্যের একটা কারণ; এ সম্বন্ধে তিনি কি বলেন ? বিশেষ যুক্তিযুক্ত কিছুই বলেন না। বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি জানেন না যে, ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল অসভ্য সবল পার্ব্বত্য জাতি বিদ্যমান আছে, তাহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। খাসিয়া, লেপচা, নাগা, গারো, লুসাই, কোল্ প্রভৃতি জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণের মত সংক্ষেপে সমালোচনা করিয়া পরে বলিয়াছেন,—"পূর্ব্ব ঋষিগণ সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহ প্রদান প্রথা চলিত করিতে গিয়া অকৃত-কার্য্য হইয়াছেন, এরূপ স্থলে যে প্রথা পুনরায় প্রচলন করিতে গেলে অনেক ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন। বৈদেশিকের কথা শুনিয়া প্রচলিত দেশাচার-সম্মত বাল্যবিবাহ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া উচিত নহে।"

বৈদেশিকের কথা শুনিয়া কেহ বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিতে বলে না; কিন্তু বাল্যবিবাহ যে পাকে প্রকারে উঠিয়া যাইতেছে, অনেক স্থলে এখন যে রজঃ দর্শনের পর বালিকাদের বিবাহ হয়, এ সম্বন্ধে তিনি কি বলেন, আমরা জানিতে চাই। আর্য্য ঋষিগণের মত সকলের একরূপ ছিল না। সময়ে সময়ে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তিনিই স্বীকার করিয়াছেন (১)। অবস্থান্তরে মত পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা জীবিত থাকিলেও সেইরূপ করিতেন। এখন আর্য্য সমাজের প্রবীণ ব্যক্তিগণ সে কার্য্য, খুব চিন্তা করিয়া সংসিদ্ধ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

---

(১) The Speeches of Eminent Indian Gentlemen ; Page 66—67.

তারপর গোপালবাবু ও বিষ্ণুপদ বাবু কোন নূতন কথাই বলেন নাই। ডাক্তার মিত্র মহোদয়ও আর্য্য সমাজের এই সাময়িক পরিবর্ত্তনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন "সাধ্য কি যে, পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রতিহত করা যাইবে? প্রাচীন সময়ে যে সমস্ত প্রথা ছিল, তাহা এখন অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে;—এখনও হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনে বাধা দেওয়া উচিত নয়।" (১) আমরাও এই কথাই বলি। তিনি রুক্মাবাই সম্বন্ধে বলেন যে, পিতার সম্মতিই হিন্দু বিবাহে যথেষ্ট। কন্যার সম্মতি না থাকিলেও বিবাহ ভঙ্গ হইতে পারে না। যে হিন্দুধর্ম্ম মানে, তাহাকেই ইহা মান্য করিয়া চলিতে হইবে। যে না মানিবে, সে হিন্দু নয়। আপনা আপনি যে পরিবর্ত্তন আসে, তাহাই অবনত মস্তকে পালন করা উচিত। বলপূর্ব্বক পূর্ব্বপ্রথা উল্টান উচিত নয়।" তাঁহার এ সকল কথা খুব যুক্তিযুক্ত; ইহার বিরুদ্ধে বলিবার আমাদের কিছুই নাই। তবে এইমাত্র

(১) The speeches of Eminent Indian gentlemen, Page 86 and 90, extracts from Dr. RajendraLall Mitra's Speech.—"This concensus of opinion is doubtless gratifying to me as a Hindu; but it is not in accord with the supreme law of nature. There is nothing in *status quo* in the universe. Change is the order of existence. The moon we behold is a burnt-up sphere; the earth of to-day is not what it was a thousand years ago, not was it a thousand years ago, what it had been ten thousand years before that. The layer above layer which we see on it, each of which took thousands of years to form, shows that it has changed greatly in course of time, it is still changing, and will go on changing to the end of time. The same changes have taken place in the forms, habits and manners of animal life, and the process of change will continue steadily on and on. Under the circumstances it is hopeless to expect that we shall be able to arrest change, and maintain an absolute *status quo*. The powers of nature are irresistible; they will bring on change, as time flows on, and we must, will we or nil we, yield and accommodate ourselves to our circumstances and surroundings. Our ancestors have done so all along, and we must do likewise." * * * * "Of course, in resisting outside force, I say nothing about the natural law about change. That operates slowly, gradually and I have not the slightest notion of opposing it. Its action may be retarded or quickened by our surroundings—our altered circumstances and requirements—and as intelligent men we should do well to promote it, when it lies in our power to do so; but I have not language strong enough fully to denounce those who will shut the doors of our schools and colleges against those who are married early (tremendous cheers and applause)."

বলি, হিন্দু সমাজের উপর দিয়া যে প্রবল পরিবর্ত্তনের স্রোত যাইতেছে, তাহার গতি নিয়মিত করিবার জন্য সমাজের খুব চেষ্টা করা উচিত। নানা কারণে বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাইতেছে, এখন ইহার স্থানে বিশেষ বিচার ও সতর্কতা পূর্ব্বক যৌবনবিবাহ প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যৌবন-বিবাহে দুর্নীতি নিবারণের উপায় কি?

বাল্যবিবাহের পরিপোষক মতগুলি, আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে, যথাসাধ্য খণ্ডন করিয়াছি। বাল্যবিবাহ অযৌক্তিক হইলে, যৌবনবিবাহই একমাত্র আদর্শ হইয়া পড়ে। পৃথিবীর অসংখ্য সভ্য এবং অসভ্য জাতি এই যৌবনবিবাহের সুশীতল ছায়ায় লালিত পালিত হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমরাও নানা কারণে যৌবনবিবাহের পোষকতা করিতেছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আরো কথা আছে।

"মানুষ, চিরকালই মানুষ। রক্ত মাংসের উত্তেজনার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া তার পক্ষে অনেক সময়ই কঠিন। ধর্ম্মের প্রবল পরাক্রমও সময়ে সময়ে এই উত্তেজনার নিকট পরাস্ত হয়। এই সময়ে মানুষকে রক্ষা করিবার উপায় কি? অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিলে যে দুর্নীতি ও অধর্ম্ম প্রশ্রয় পাইবে, তাতে আশ্চর্য্য কি?" আমাদের কোন প্রবীণ শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম ভ্রাতা এই প্রশ্নটী করিয়াছেন। তিনি দেখিয়া শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছেন, এই গভীর সমস্যার মীমাংসা করিতে পারেন নাই।

এ সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রতিবাদকারী ব্যক্তি বলেন,—"এতদ্ব্যতীত আপনি এক প্রকারের কার্য্যকে ধর্ম্মের কার্য্য মনে করিতে পারেন, অন্যে তাহাকে সেরূপ করিতে না পারে। সুতরাং ভিন্ন লোকের ভিন্ন সংস্কারবশতঃ এই বিষয়ে মতের একতা থাকা কঠিন (১)।" কোন্‌টী ধর্ম্মের কার্য্য, কোন্‌টী নয়, এ সম্বন্ধে যদি সকলের একরূপ মত না হয়, তবে কোন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে পারে কি না, বড়ই সন্দেহ। ব্যক্তিগত মতের বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও কতকগুলি সার্ব্বভৌমিক মত হইয়া সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত

(১) নব্যভারত পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয় তৃতীয় সংখ্যা, ১৩২ পৃষ্ঠা।

হইতে পারে। ধর্ম্মমত একরূপ না হইলে সমাজের একপ্রাণতা সংগঠিত হওয়া কঠিন। যেখানে ধর্ম্মমতে আকাশ পাতাল প্রভেদ, সেখানে নীতিবোধেও আকাশ পাতাল প্রভেদ। ধর্ম্ম ও নীতি উভয়ই এক সূত্রে গ্রথিত, বিজড়িত। একটীকে উড়াইয়া দেও, অন্যটী অমনি ঢলিয়া পড়িবে। ধর্ম্ম ও নীতিবোধ যদি সকলের একরূপই না হওয়া সম্ভব হয়, তবে আর সমাজের দাঁড়াইবার ঠাঁই কোথায়? সমাজের মূল ভিত্তি—নীতি ও ধর্ম্মবন্ধন, এই দুটী যেখানে নাই, কিম্বা যেখানে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, সে সমাজ পৃথিবীতে অতি অপকৃষ্ট সমাজ, স্বেচ্ছাচারিতার আধার। কেন?—সংক্ষেপে বলিতেছি।

মনে কর, মনোনয়ন-প্রথা অনুসারে বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। বর কন্যা, কোর্টসিপের অবস্থায়, পরস্পরকে চুম্বন করিতেছেন। এমন লোক আমাদের দেশে অনেক আছেন, একথা শুনিলে যাহাদের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিবে। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন বা করিতেছেন, অন্ততঃ তাঁহারা ইহাকে ধর্ম্মের কার্য্য মনে করিতে পারেন। যে যে কার্য্য করে, সে তাহাকে কোনরূপে ভাল কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেই করে। মনে কর, কোর্টসিপের অবস্থায়, বরকন্যা উভয়ে উভয়ের অঙ্গ স্পর্শ করিতেছেন, একত্রে বসিয়া নানারূপ ক্রীড়া কৌতুক করিতেছেন, এবং ভাবপ্রাবল্যে পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছেন। কেহ কেহ এরূপ কার্য্যকে গর্হিত কার্য্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু করিলে কি হইবে? ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শ ত সকলের একরূপ নয়;—এইরূপ আলিঙ্গনের পক্ষপাতী বরকন্যার দল, ইহাকেই ধর্ম্ম ও নীতির লক্ষণ মনে করেন! কি করিবে বল? আর দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রতিবাদকারী ব্যক্তিগণ কোন ঘটনা জানুক আর নাই জানুক, সে জন্য ঘটনা অপেক্ষা করে না (১)। যৌবন-বিবাহে এরূপ ঘটনা কাল্পনিক নয়। এই সকল জঘন্য কার্য্য করিয়া লোকেরা সমাজকে অধঃপাতে দিবে, অথচ মতের বিভিন্নতা থাকিতে পারে বলিয়া, তাহা পুণ্য এবং সুনীতির নামে বিক্রীত হইবে,

(১) আমরা এই পুস্তকের তৃতীয় পৃষ্ঠায় ব্যক্ত করিয়াছি, স্থানে স্থানে ১১।১২ বৎসর বয়সের সময় বর কন্যার দেখা সাক্ষাৎ আরম্ভ হয়। আমাদের প্রতিবাদকারী মহাশয় এরূপ ঘটনা জানেন না বলিয়া পঞ্চম খণ্ড নব্যভারতের ১৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি না জানিলেই যে ঘটনা ঘটে নাই, ইহা কখনও প্রমাণিত হয় না। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সর্ব্বত্র এরূপ ঘটে না।

ইহাপেক্ষা সমাজের পক্ষে আর কি শোচনীয় অবস্থা হইতে পারে? যে সমাজে এরূপ হয়, সে সমাজ স্বেচ্ছাচারিতার সমাজ নয় ত কি? নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সমাজে সকলের একরূপ ধারণা নাই, সে সমাজ স্বেচ্ছাচারিতার পূতিগন্ধময় নরকে নিমজ্জিত। সেখানে বিবেকের দোহাই দিয়া, যার যা ইচ্ছা, সে তাহাই অবাধে করে। ব্যক্তিগত বিবেকের শাসকরূপে, মানবসাধারণের সমবেত বিবেকশক্তি যদি প্রতিষ্ঠিত না থাকে, তবে মানুষকে দুর্নীতি হইতে কে রক্ষা করিবে? ব্যক্তিগত খেয়ালের দুষ্কার্য্যরূপ মলিনতা হইতে কে নীতিকে বাঁচাইবে? বর্ত্তমান সময়ে ব্যক্তিগত বিবেক-স্বাধীনতা প্রচারে যে অপকার হইতেছে, পূর্ব্বে আমরা তাহা দেখাইয়াছি। ব্যক্তিগত বিবেক-স্বাধীনতার শাসনের জন্য সমাজের সমবেত বিবেকের মহাস্বর বা মহাশক্তির উত্থানের একান্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে, আজ যাহা নীতি, কাল তাহা দুর্নীতিতে; আজ যাহা দুর্নীতি, কাল তাহা সুনীতি-রূপে প্রচারিত হইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজে যদি নীতি ও ধর্ম্মের মূলভিত্তি স্থিরীকৃত না হয়, তবে এই সমাজ যে দেশের মধ্যে মহা কলঙ্কের সমাজ হইবে, তাতে সন্দেহ কি? কিন্তু আমরা ব্রাহ্মসমাজকে এখনও সেরূপ স্বেচ্ছাচারী সমাজ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। আমরা মনে করি, মূলধর্ম্মে বিভিন্নতা অতি অল্প। একতাই ধর্ম্মের লক্ষ্য। তবে সামান্য সামান্য বিষয়ে বিভিন্নতা থাকা সম্ভব। মানুষের আকৃতি পৃথক্, মনের অবস্থা পৃথক্, কিন্তু আবার দেখ, এক উপাদানে মানুষ নির্ম্মিত। পরস্পরের অস্থি মাংস প্রভৃতির সংখ্যা এবং মূল আকৃতি প্রায় সর্ব্বস্থানেই একরূপ। ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধেও অবান্তরিক স্থলে সহস্র সহস্র মতভেদ সম্ভব, কিন্তু আবার মূলে মিলনও অতি আশ্চর্য্যজনক। মূলে ধর্ম্ম, সার্ব্বভৌমিক। ধর্ম্মকার্য্য, মূলে এক। মূল ভিত্তিতে সকলে এক। একের কোলে যখন, তখন সকলে এক। অনন্ত প্রকৃতি সেখানে একীভূত। পৃথিবীতে যত সম্প্রদায় আছে, যত দল আছে, সকলেরই দাঁড়াইবার, মিলিবার একটা ঠাঁই আছে। ব্রাহ্ম-সমাজে যদি তাহা অসম্ভব হয়, তবে ইহা যে পিশাচের লীলাক্ষেত্র হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বাঁধাবাঁধি নিয়ম করায় দোষ অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু গুণও অনেক আছে। আমাদের বিবেচনায় সমাজ স্থাপন, এ কথাটী বলিলেই বাঁধাবাঁধি নিয়ম বুঝায়। কোন নিয়ম রাখিবে না, কোন এক প্রথা অন্ততঃ

কতকদিনও মানিবে না; যার যা ইচ্ছা, তাকে সেইরূপই করিতে দিবে, অথচ জগতের কাছে বলিবে, একটা ধর্ম্মসমাজ গঠন করিতেছ, এ যে কিরূপ কথা, বুঝি না। সমাজ থাকিলেই মূলে একতা থাকা চাই। সমাজের মূলবন্ধন, ধর্ম্ম ও নীতি। ধর্ম্ম ও নীতির একতা নাই, অথচ সুসভ্য সমাজ আছে, ইহা অসম্ভব। যদি সেরূপ কোন সমাজ থাকে, তবে তাহা সমাজ নহে, নরক। ব্রাহ্মসমাজকে নীতিবন্ধনে ও ধর্ম্মবন্ধনে যাঁহারা বাঁধিতে পারিবেন না, মনে করেন, তাঁহারা যে কেমনে ইহাকে রক্ষা করিবেন, জানি না। যদি ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশের মত এইরূপ বিশৃঙ্খল হয়, তবে এ সমাজ হইতে কাজেই সময়ে দূরে পলায়ন করিতে হইবে।

এখন আমাদের পূর্ব্বোক্ত প্রবীণ বিজ্ঞ ব্রাহ্ম ভ্রাতার কথা কয়েকটীর একটু আলোচনা করি। যৌবন-বিবাহে দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রশ্রয় পাওয়ার সম্ভাবনা খুব অধিক, তৎপক্ষে কোন সংশয় নাই। কিন্তু নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যদি অন্ততঃ অধিকাংশ লোকের একটী পাকা মত দাঁড় করান যায়, তবে নীতি-শিথিলতা নিবারণের যথেষ্ট উপায় আছে। সমাজ মানবমণ্ডলীর বিবেকসমষ্টির অনুমোদন দ্বারা চালিত এবং সুরক্ষিত। অভ্রান্ত শাস্ত্র এবং গুরু ভিন্নও সমাজ চলিতে পারে এবং সেটা কিছু নূতন কথা নয়। অধিকাংশ ব্যক্তির সম্মিলিত সমষ্টি-বিবেকানুমোদিত পথে, বাধ্য হইয়া, বিপথগামী ব্যক্তিকে চলিতে হয়। না চলিলে মিলিত বিবেক-সমষ্টি শাসকরূপে দণ্ডায়মান হইয়া মানুষকে শাস্তি দেয়। মিলিত বিবেকসমষ্টির দ্বারা যে সমাজে একটী আদর্শ মত বা প্রণালী স্থিরীকৃত না হইয়াছে, সেই সমাজের পতনের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যেখানে সমবেত শক্তিতে একটা মত দাঁড়াইয়াছে, সেখানে সেই মতকে মান্য করিয়া সমাজের লোক চলিতে বাধ্য। মনে কর, এক সমাজে পঞ্চাশ জন লোক। ৪০ জন লোকের বিবেকের দ্বারা একটা নীতি ও ধর্ম্মমত স্থিরীকৃত হইয়াছে। বাকী দশজন ব্যক্তি তাহাতে মিলে নাই। তাহারা বিপথে যাইতেছে। সে স্থলে সেই দশ জন ব্যক্তিকে, সমবেত বিবেকশক্তি শাসকরূপে দাঁড়াইয়া, বিপথ হইতে ফিরাইবেই ফিরাইবে। বিবেকের শাসন বড় দুর্জ্জয় শাসন। মানুষ আপন বিবেকানুসারে যখন চলে না, কিম্বা স্বেচ্ছা যখন বিবেক স্থানীয় হইয়া ভ্রমসঙ্কুল পথে মানুষকে চালায়, কুকার্য্যে যখন মানুষ মজে, তখন মানবসমাজের সমবেত বিবেকশক্তি তাহাকে ফিরাইয়া আনে। প্রকৃত

বিবেকের শাসনে প্রহার নাই, নির্যাতন নাই, কর্কশ কথা নাই, রাগ নাই, বিদ্বেষ নাই, অথচ সে শাসনের নিকট সকলে অবনত-মস্তক। বিবেকশক্তি জগতের রাজা, রাজার রাজা, সমাজের নেতা। ইহাকে উপেক্ষা করে, কার সাধ্য? রক্ত মাংসের ক্ষমতা অনেক বটে, কিন্তু মানবের মিলিত বিবেক-সমষ্টির ক্ষমতা দুর্জ্জয়। একটার সীমা আছে, অন্যটার সীমা নাই। এই অসীম শক্তির নিকট দুর্দ্দান্ত সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী মানুষও অবনত। এ শক্তি কি সামান্য শক্তি? বিশ্বাধার চিৎস্বরূপ এই শক্তিতে বিদ্যমান। এ শক্তি তাঁহারই শক্তি, মানুষ উপেক্ষা করিবে, সাধ্য কি? আমরা মানুষের পরাক্রমের কথা, রক্ত মাংসের দুর্দ্দম্য শক্তির কথা যখন ভাবি, তখনই মনে হয়, যদি সমবেত বিবেকের একটা শক্তি সমাজের মধ্যে দাঁড় করান যায়, তবে বুঝি বা পতনের কোন আশঙ্কা থাকে না। সমবেত বিবেকের অনুমোদনে নীতির মূল-ভিত্তি স্থিরীকৃত হওয়া নিতান্ত সম্ভবপর বলিয়া মনে করি। এই বিবেকের দ্বারাই চিরকাল নীতির মূল স্থিরীকৃত হইয়াছে। যাহা এত কাল হইয়াছে, এখন তাহাই হইবে। ব্রাহ্মসমাজে নীতি ও ধর্ম্মের একটা অটল ভিত্তি নিরূপিত হইলে, যৌবন-বিবাহে নীতি-শিথিলতার সম্ভাবনা থাকিলেও, তাহা নিবারিত হইবে। যে বিবেকের নীরব শাসনের দ্বারা পতিতা য়িহুদী রমণীর উদ্ধার হইয়াছিল, (১) জগাই মাধাইর ন্যায় শত সহস্র পাষণ্ড জীবন পাইয়াছিল, সেই বিবেকের শাসন সামান্য শাসন নয়। মানুষ, তুমি দুর্ব্বৃত্ত পশুসম মানব রিপুর দুর্দ্দান্ত প্রতাপ দেখিয়া ভীত হইয়াছ? ভয় নাই। এই বিবেক-শাসনের নিকট উপস্থিত হইলে অমনি তাহার মস্তক অবনত হইবে। ব্রাহ্ম-সমাজে বিবেক-শাসনের প্রবল প্রতাপ কিছু মন্দীভূত হইয়াছে বলিয়া আজ কাল প্রবীণ ব্যক্তিগণও ভীত হইয়াছেন। কিন্তু অটল বিশ্বাসী কেশব চন্দ্রের সময়ে সেরূপ ভয় ছিল কিনা, সন্দেহ। তখন মানুষ দুর্নীতি বা অন্যায় কার্য্য করিলে প্রশ্রয় পাইত না, এখন বিবেকশক্তি কতক শিথিল, কতক মন্দীভূত, তাই যার যা ইচ্ছা করিয়া যাইতেছে, কেহই কিছু গতিরোধ করিতে পারিতেছে না। তাই পাপীও বুক ফুলাইয়া পাপ কার্য্যের পোষকতা করিয়া ফিরিতেছে। এই পৃথিবী এমন ঠাঁই, এখানে সকল কার্য্যেরই পরিপোষক পাওয়া যায়। এই নীতিশিথিলতারও পরিপোষক জুটিতেছে।

(১) St. Luke, Chap. VII. 37 to 47.

দশ জনে যে কার্য্যকে ঘৃণা করিতেছে, আর দশ জন সেই কার্য্যেরই পোষকতা করিতেছে। দশ জন যে বিবাহে যোগ দিতেছে না, আর দশ জনের দ্বারা সেই বিবাহই সংসাধিত হইতেছে। এমন কি, দুষ্কার্য্য করিয়া পরে কোন নিভৃত প্রদেশে যাইয়া বিবাহ করিয়া আসিতেছে। যাঁহাদের সমক্ষে অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তাঁহারা ত আর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারে না, সুতরাং বিদেশে যাইয়া নূতন বন্ধু বান্ধবের সাহায্যে বিবাহিত হইয়া বুক ফুলাইয়া ফিরিতেছে। ব্রাহ্মসমাজের বিবেকশক্তির যে গভীর হুঙ্কার কুচবিহার বিবাহের সময় ভারতবর্ষে বিষম আন্দোলন তুলিয়াছিল, সেই সমবেত বিবেকশক্তির তেজ যেন আজ মন্দীভূত! তাই ব্রাহ্মসমাজে পাপকার্য্য প্রশ্রয় পায়, অথচ কেহ কথা বলে না। ছি, পাপকার্য্যও আবার ধর্ম্মের নামে বিক্রয়ের চেষ্টা! সমাজ ডুবিয়া যায়, অথচ মানুষ সচকিত হয় না! দৃষ্টান্ত দেখাইয়া নাকি আজ আবার মানুষকে জাগাইতে হইবে! চক্ষের সম্মুখে নানা বীভৎস ব্যাপার ঘটিতে দেখিয়াও যাহারা দৃষ্টান্ত দেখিতে চায়, চিরনিদ্রিত তাহাদিগকে আর কে জাগাইয়া দিবে? আমরা স্থানে স্থানে যেরূপ গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হইয়াছে যে, বিবেকের শাসন যেন ক্রমেই ব্রাহ্মসমাজে মন্দীভূত হইতেছে। মনে হইয়াছে, আর কোন সম্বন্ধে না হইলেও নীতি সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের পতন হইয়াছে। রিপুর উত্তেজনায় উন্মত্ত যুবকবৃন্দের তাই এত উল্লাস, তাই এত আস্ফালন! এই আস্ফালনে যদি কোন ভয়ের কারণ থাকে, তবে সে কারণ এই যে, সমবেত বিবেকশক্তি শিথিলতা প্রাপ্ত হইতেছে। এই দুর্জ্জয় প্রহরী সমবেত বিবেক-সিংহকে জাগাইয়া রাখিতে পারিলে আর ভয় কি, ভাবনা কি? এই দুর্জ্জয় সিংহ যদি মরণের কোলে চিরনিদ্রিত থাকে, তবে যৌবন বিবাহে দুর্নীতি নিবারণের আর উপায় নাই।

আমরা বলিয়াছি, সম্মিলিত বিবেকশক্তির অনুমোদনে নীতির একটী ভিত্তি সংস্থাপিত হইতে পারে; এবং ব্রাহ্মসমাজে তাহা প্রতিষ্ঠিত করার বড়ই প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। নীতিবোধ, ধর্ম্মবোধ না থাকাতেই যে ব্রাহ্মসমাজে দিন দিন নীতি-শিথিলতার কারণ ঘটিতেছে এবং আধ্যাত্মিক পতন হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। নূতন সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, নূতন নূতন লোকের সমাগমে, পুরাতনের স্থানে অনেক নূতন হাবভাব প্রশ্রয় পাইতেছে। পুরাতন ও নূতনের সামঞ্জস্য রক্ষা

করিয়া, নূতন নীতি-আইন (moral code) প্রণয়ন করার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কেবল নবীন লোককে প্রশ্রয় দিলে চলিবে না, প্রবীণ জ্ঞানী ধার্ম্মিক লোকদিগকেও এই সময়ে খাটিতে হইবে। স্থিতিশীল, অনুদার, সঙ্কীর্ণমনা বলিয়া তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিলে ভাল হইবে না। সমবেত শক্তি ও সমবেত কার্য্য চাই। নীতির আইন-প্রণেতা—মানব সমাজের সমবেত বিবেক-শক্তি। এটা অন্যায় কি সেটা অন্যায়, এইরূপ বিবাদ বিসম্বাদ না করিয়া, প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় বিবেকের ধূয়া ধরিয়া স্বেচ্ছার পথে না যাইয়া, প্রত্যেকে রাজত্ব করিতে প্রয়াসী না হইয়া, সকলে মিলিয়া একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করুন। এইরূপে একটা নীতির ভিত্তিমূল গঠিত হউক। পরস্পরের মতকে উপেক্ষা করা সহজ কার্য্য। পরস্পরকে ঘৃণা করা আরো সহজ, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বিধাতার যে লীলামাহাত্ম্য দেদীপ্যমান, তাহার সাহায্যে একটা সমবেত বিবেকভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন বটে। কিন্তু কঠিন হইলে কি হইবে, ইহা করিতে না পারিলে উশৃঙ্খল সমাজ যে কেমনে রক্ষা পাইবে, কে যে রাজ্যকে পালন ও সংরক্ষণ করিবে, বুঝিনা। একটা কিছুকে authorityর ন্যায় মান্য করিতেই হইবে। সে authority এই সম্মিলিত-বিবেকশক্তি (Voice of Humanity)। ব্রাহ্ম-সমাজে অন্য কোন authority প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই ঝগড়া বিবাদ, কলহ বিদ্বেষের দিনে যে সকল ধার্ম্মিক প্রবীণ ব্যক্তি এই পবিত্র কার্য্যে সিদ্ধ-মনোরথ হইবেন, তাঁহাদের দ্বারা এই সমাজের অনেক উপকার হইবে। এই-রূপ নিয়মের পক্ষপাতী হইয়াই, মহাত্মা কেশব চন্দ্র নবসংহিতা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মসমাজের সম্মিলিত বিবেকশক্তির দ্বারা তাহা গঠিত নয় বলিয়া, তাহা উপাদেয় হইলেও, গুরুবাদের আশঙ্কায়, অনেকে সে পুস্তককে আদর্শ করিয়া ধরিতে পারিতেছেন না। পরন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক লোক সে পুস্তককে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। সে যাহা হউক, সমাজ রাখিতে গেলেই এরূপ নিয়ম প্রণালী প্রস্তুত করিতে হইবে। না করিলে মঙ্গল নাই। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান স্বেচ্ছা-চারিতার অবস্থায়, সেরূপ নিয়ম প্রস্তুত হইতে পারিবে কি না, সে বিষয়ে কিন্তু আমরা বড়ই সন্দেহ-যুক্ত হইয়া পড়িয়াছি। যেরূপ স্বেচ্ছাচারিতা প্রশ্রয় পাইয়াছে, এবং পাইতেছে, ব্রাহ্মসমাজে আর বাঁধাবাঁধি নিয়ম স্থাপন করা বড়ই সন্দেহের বিষয়। অন্য সমাজের লোকেরা বা "শত্রুরা"

ব্রাহ্মসমাজকে প্রশংসা করিলেই স্বর্গলাভ হয় না। আমরা যাহা জানি, সে সম্বন্ধে অন্যের অন্যায় প্রশংসা আমাদের প্রাণে আরো বাজে। অন্যের প্রশংসার ভিখারী না হইয়া, বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তায় সকলেরই মনোনিবেশ করা উচিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সামাজিক অধিকার।

"Alas for a Church without righteousness and a State without right."

Theodore Parker.

ক্রমে আমরা একটী বিষম সমস্যাপূর্ণ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সামাজিক অধিকার, এ দুয়ের মধ্যে সীমা রেখা নির্দ্ধারণ করা বড় সোজা কথা নয়। যাঁহারা বিবেকের কথা পালন করিয়া চলিতে চান, তাঁহাদিগের মতের সহিত সমাজের প্রচলিত মতের অনৈক্য হইলে, সমাজ তাহাতে বাধা দিতে অধিকারী কি না?—এই প্রশ্নটী আপনা আপনিই মনে উদয় হয়। সমাজ যদি এরূপ স্থলে বাধা দিতে অধিকারী না হয়, তবে ব্যক্তিগত খেয়াল বা স্বেচ্ছাচারিতার আদেশ বা বিবেকের ভ্রম প্রমাদপূর্ণ কথার অপকারিতা নিবারণের উপায় কি? এ সকল বিষয় একবার ধীর ভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

একথা একরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত যে, ব্যক্তির সমষ্টিতে যে সমাজ গঠিত, অর্থাৎ ব্যক্তিগত সমবেত শক্তি লইয়া যে সমাজ অবয়ব পাইয়াছে, সে সমাজ মানবের পক্ষে কল্যাণকর। সমাজ ভিন্ন মানবের উন্নতি অসম্ভব। আদর্শ নীতি বা আদর্শ ধর্ম্মমত প্রত্যাহিক জীবনে প্রতিপালন করিতে না পারিলে, নীতি বা ধর্ম্মের অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকিলেই কিন্তু মানবের উপকার হয় না। সমাজ এই নীতি এবং ধর্ম্মমত পালন করিবার পক্ষে ব্যক্তিকে এরূপ সাহায্য করে যে, সে সাহায্য আর কোন রূপে পাওয়া যায় না। এই জন্যই পৃথিবীতে সমাজের সৃষ্টি। যে সমাজ যে পরিমাণে ব্যক্তিগত জীবনে নীতি এবং ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার সহায়তা করিতে সক্ষম, সেই সমাজ সেই পরিমাণে আদর্শ। যে কারণেই হউক, ব্রাহ্মসমাজ দিন

দিন একটা পৃথক্ সমাজের আকার ধারণ করিতেছে। কি পরিমাণে এই সমাজ আদর্শ নীতি পালনে সমর্থ হইতেছে, উনষষ্টি বৎসর পরে ইহার আলোচনা করা কোন ক্রমেই অযৌক্তিক নয়। আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, আদর্শ নীতিই এ পর্য্যন্ত সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে ঠিক হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, ঠিক হওয়া সম্ভবপরও নয়, কারণ পৃথিবীতে নর নারীর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ;—মানুষে মানুষে কত বিভিন্নতা, কত পার্থক্য। এ সম্বন্ধে আমরা বলি, পার্থক্য অনেক আছে বটে, কিন্তু মিলও যথেষ্ট আছে। সকলেরই শারীরিক পরিশ্রম প্রয়োজন, শরীরে আঘাত লাগিলে সকলের দেহই ক্ষত হয়, ইত্যাদি। না—কেবল এরূপ মিল নয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, রিপু এবং মানসিক ও শারীরিক শক্তি-তেও যথেষ্ট মিল আছে। এতদ্ভিন্ন চিন্তা-জগতেও মিল আছে। চিন্তা-জগতে যদি মিলন সম্ভব, তবে, মানবতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে, তাঁহাদের উন্নতির জন্য নীতি প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করা কেন অসম্ভব হইবে? অর্থাৎ তাহাতে মানব সাধারণের অমিল হইবে কেন? এ সম্বন্ধে মিল, স্পেনসার প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, সমাজ পরিচালনার জন্য নিয়মাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব; এবং তাহা না হইলে সমাজ চলা দুষ্কর (১)। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অনেকে বলেন, "বিবেকের স্বাধীনতার উপর সমাজকে ছাড়িয়া দেও, যাহা হইবার হইবে। সমাজ ডুবিতে হয় ডুবিবে, জাগিতে হয় জাগিবে। যে সকল নেতা বা অভিনেতা এইরূপ কথা বলেন, কার্য্যকালে দেখিয়াছি, তাঁহারাও কিন্তু এই স্বাধীনতার সম্মান রাখিতে পারেন না; অর্থাৎ তাঁহারাও, কেহ তাঁহাদের মত-বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে, বাধা দিতে ছাড়েন না। সুতরাং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথাটা একটা মুখের ফাঁকা আওয়াজ মাত্র, কোন সমাজ এইরূপ স্বাধীনতা লইয়া জীবিত থাকিতে পারে নাই। সকল সমাজেই আদর্শ নীতি প্রতিষ্ঠিত রাখা ও তদনুসারে কার্য্য করা একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে (২)। ব্রাহ্মসমাজে আদর্শ নীতি স্থিরীকৃত হওয়া

---

(১) "Though it may be impossible to say that a given law will produce a foreseen effect on a particular person, yet no doubt is felt that it will produce a foreseen effect on the mass of persons." *Herbert Spencer.*

(২) "Until there be such a body of truths; universally acknowledged

উচিত, এবং সমাজের পক্ষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, যাহাতে ব্যক্তিগত জীবনে সেই নীতি প্রতিপালিত হয়, তৎপক্ষে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। ব্রাহ্ম-সমাজে আদর্শ নীতি ঠিক না হইলে, তাহা পালনে কিরূপে সক্ষম হইবে? আদর্শ নীতি পালনে অক্ষম হইলে, সে সমাজই বা কিরূপে মানব সমাজের কল্যাণ সাধনে সক্ষম হইবে? অথবা আদর্শ নীতি পালনে অক্ষম হইয়া কেমনেই বা তাহা জীবিত থাকিবে?

প্রথমত দেখা উচিত, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা বিবেকের কথা সর্ব্ব স্থানে ঠিক হয় কি না? ঠিক না হইলে সে ভুলের জন্য দায়ী কে?—ঠিক করিবার উপায়ই বা কি?

একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে কতকগুলি কার্য্য কেবল নিজকে লইয়া, আর কতকগুলি কার্য্যের সহিত অপরের যোগ আছে; অর্থাৎ কতকগুলি কার্য্যের ফলভোগ কেবল নিজকে করিতে হয়, কতকগুলির ফলভোগ অপরকেও সহিতে হয়। যে কার্য্যের ফলভোগ নিজের, সে কার্য্যে বয়স্ক ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকে থাকুক। তাহাতে কাহারও বাধা না দিলেও চলে। তবে এরূপ স্থানেও পরামর্শ প্রভৃতি প্রদানের অবশ্য প্রয়োজন আছে। আমি এমন একটা জিনিস আহার করিতেছি, যাহাতে আমার ভয়ানক পীড়া হইতে পারে। ইহাতে আমার স্বাধীনতা আছে; কিন্তু এরূপ স্থলে বন্ধুদের পরামর্শ চলে; শাসন চলে না। কারণ, ইহার ফলভোগী কেবল আমি। বালকের পক্ষে এরূপ স্থলেও শাসন চলে; কিন্তু আমি যদি একজনের বাড়ীতে যাইয়া একজনের দ্রব্য বিনষ্ট করিয়া ফেলি, তাহার ফলভোগী আমি নই, অপরে; সুতরাং ইহাতে আমার স্বাধীনতা নাই। রাজ আইন বা সমাজবিধি এ স্থলে আমাকে দণ্ড দিতে, আমার অধিকারকে খর্ব্ব করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী (১) বিবেক কখনও অন্যের অনিষ্ট করিতে বলে না অন্যদিকে আমার বিবেক বলিলেই

---

and respected, society must remain in a state of profound disorder, whatever unanimity may exist upon matters of minor importance."

Social Science.

(১) "Man needs a social code to prevent him from annoying and offending his neighbours." * *

"The action of society is extremely valuable in protecting by ceremonial observances those who are undefended by law, or by nature, or by both." *Hints on Bacon's Essays.*

যে আমি অন্যের অনিষ্ট করিতে অধিকারী, তা নয়। চিন্তাতে, লেখাতে, বক্তৃতাতে, এবং নিজ শরীর প্রভৃতি সংরক্ষণে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা* উচিত; কিন্তু যেখানে অন্যের সহিত যোগ, সেখানে মানুষ, সমাজ বা রাজার কথা পালন করিতে নিতান্ত বাধ্য। বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম। একেকে অপরের মুখ চাহিয়া চলিতেই হইবে। এই-রূপ মানব সমাজের সমুদায় কার্য্য, মানব সাধারণের সমবেত শক্তিতে, পরস্পরের সাহায্যে নিয়মিত হইতেছে, এবং হওয়া একান্ত আবশ্যক (৪)। সমাজে যে সকল মানুষ বাস করে, তাঁহারা অন্যের অনিষ্ট করিবেন না, ইহাই কিন্তু নীতি নয়; তাঁহাদিগকে অন্যের উপকারও করিতে হইবে। দোষ করিব না, অন্যের অনিষ্ট করিব না, মিথ্যা বলিব না, কেবল এগুলিতে নীতি রক্ষিত হয় না। পুণ্য সঞ্চয় করিব, অন্যের উপকার করিব সত্য আচরণ করিব, ইহাই প্রকৃত নীতি। এইরূপ উভয়বিধ কাজে মানুষকে নিয়মিত করিতে সমাজ অধিকারী (৫)। কারণ সমাজের নিকট এবং মানুষের নিকট মানুষ

"In the conduct of human beings towards one another it is necessary that general rules should for the most part be observed. * *

"The only part of the conduct of any one for which he is amenable to society, is that which concerns others. In the part which concerns himself, his independence is, of right, absolute." * * It is, perhaps, hardly necessary to say that this doctrine is meant to apply only to human beings in the maturity of their faculties. * * Those who are still in a state to require being taken care of by others, must be protected against their own actions as well as against external injury."

John Stuart Mill.

(৪) "And the total actions of mankind, considered as a whole, are left to be regulated by the total knowledge of which mankind is possessed."

Buckle's History of Civilization.

(৫) "And to perform certain acts of individual beneficence, such as saving a fellow creature's life, or interposing to protect the defenceless against ill-usage, things which whenever it is obviously a man's duty to do, he may rightfully be made responsible to society for not doing. A person may cause evil to others not only by his actions, but by his inaction, and in either case he is justly accountable to them for the injury." *John Stuart Mill.*

"It is not enough not to do harm to your brethren; you are bound to do good to them. You are bound to act according to the Law."

Joseph Mazzini.

যে সাহায্য পায়, তাহার প্রতিদান না করিলে মনুষ্যত্ব লাভ হয় না। এজন্যও মানুষকে সকলের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইবে। সেবা করা, অন্যের উপকার করা মানুষের জীবনের মহা ব্রত। এই মহাব্রত পালন করিতে, ন্যায়ত, ধর্ম্মত, মানুষ সমাজের নিকট বাধ্য, না করিতে মানুষের স্বাধীনতা নাই। পিতা মাতা যদি সন্তানকে প্রতিপালন না করে, তাহা হইলে যেমন তাহারা সমাজ ও ধর্ম্মের নিকট অপরাধী; রোগীর শুশ্রূষা, দরিদ্রের সাহায্য ইত্যাদি না করিলে মানুষ তেমনই অপরাধী হয়। বিধাতার সৃষ্টিতে এ বাধ্যবাধকতা থাকিবেই থাকিবে।

ব্রাহ্মসমাজে বিবেক-স্বাধীনতাটা খুব প্রচারিত হইয়াছে, একথা আমরা পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি। গুরুবাদ এবং শাস্ত্রের অভ্রান্তবাদ হইতে মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য এই বিবেক-স্বাধীনতার ঘোষণার কতকটা প্রয়োজন ছিল, স্বীকার করি। কিন্তু ইহার অপকারিতাও যথেষ্ট আছে, তাহাও ভাবা উচিত ছিল। ব্রাহ্মসমাজ সেই অপকারিতা যথেষ্ট ভোগ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এই বিবেক-স্বাধীনতা সম্বন্ধে আজ আর একটু আলোচনা করার প্রয়োজন হইতেছে। কারণ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পূর্ণ রূপে এই কথাটার উপর নির্ভর করিতেছে।

বিবেকের কথা যে সব সময়ে ঠিক হয় না, তাহার প্রধান যুক্তি এই যে, নীতির সাধারণ ভিত্তি একরূপ হইলেও, মানুষের পরস্পরের ধর্ম্ম মতে নানারূপ পার্থক্য দেখা যায়। একজন যাহাকে ধর্ম্মকার্য্য বলে, অপর তাহাকেই অধর্ম্ম বলে। পৃথিবীতে চিরকাল এইরূপ বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। নিজের বিবেকের কথার সহিত অপরের কথায় অমিল হইতেছে, যখন দেখা যায়, তখন দুই জনের মধ্যে একজনের ভুল আছেই। কাহার ভুল, কে ঠিক করিবে? এ ভুল ঠিক করিতে একমাত্র মানব সম্প্রদায়ের সমবেত বিবেক সমর্থ।

বিবেকের কথায় ভুল থাকিতে পারে, থাকা সম্ভব,—এই জন্য, কেহ কেহ বলেন, অভ্রান্ত শাস্ত্র বা অভ্রান্ত গুরুর কথা পালন করা উচিত। এ কথার উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলা যায়, এমন শাস্ত্র পৃথিবীতে নাই, যাহা চিরকাল মানবের কল্যাণ সাধন করিতে পারিয়াছে, বা যাহা চিরকাল মানব পালন করিয়া আসিয়াছে। শাস্ত্রের অভ্রান্ততা সকলের পক্ষে সমান প্রতিপাল্য হইলে, পৃথিবীতে শাস্ত্রের পর শাস্ত্রের অভ্যুদয় হইত না।

আমাদের দেশে একটা প্রচলিত কথা এই, নানা মুনির নানা মত। বাস্তবিক, বিশালবিস্তৃত হিন্দুশাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিলে দেখা যায়, এমন বিধি অতি অল্পই আছে, যাহার বিরোধী বিধি নাই। এক সময়ের শাস্ত্রের কথা অন্য সময়ে খণ্ডিত হইয়া নূতন বিধি প্রচলিত হইয়াছে। সময়ের আবর্ত্তনে, অল্পে অল্পে পূর্ব্ব শাস্ত্রের কথা অগ্রাহ্য করিয়া মানুষ নূতন শাস্ত্রের কথা প্রতিপালন করিয়াছে। পৃথিবী এ সম্বন্ধে বিবর্ত্তনবাদের (law of evolution) নিয়মানুসারে ক্রমাগত অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাইতেছে (৬)। এমনই হইয়াছে, দেখা যায়, মনুসংহিতার ন্যায় মহা মূল্যবান গ্রন্থের নিয়ম সকলও দিন দিন উপেক্ষিত হইতেছে। পরিবর্ত্তন সৃষ্টির নিয়ম। পরিবর্ত্তন সৃষ্টিতে অপরিহার্য্য। শিক্ষা এবং সময়ের পরিবর্ত্তনে মানব সমাজও আমূল পরিবর্ত্তিত হইতেছে (৬ a)। এরূপ না হইয়াও পারে না। প্রাচীন ইহুদী সমাজের পানে যখন দৃষ্টিপাত করা যায়, তখন কি দেখা যায়?—প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের অভ্রান্ততা রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত বিবেক-স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করা হইল—খ্রীষ্টকে ক্রূসে বিদ্ধ করিয়া হত করা হইল! সেই রক্তপাত হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্রের বীজ উপ্ত হইল। তারপর আবার কত মহাত্মার অভ্যুদয়, কত রক্তপাত, কত পরিবর্ত্তন—কত মত-যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, কে না জানেন? এক বাইবেলকে আশ্রয় করিয়া আছে যে খ্রীষ্টসম্প্রদায়, তাহার মধ্যে কত দল, কত মতের বিভিন্নতা! এ সকল দেখিয়াও আর কেমন করিয়া বলিব যে, শাস্ত্র অভ্রান্ত! শাস্ত্র অভ্রান্ত হইলে যুগে যুগে তাহার এত পরিবর্ত্তন হইত না; আবহমানকাল মানুষ অবনত মস্তকে তাহা প্রতিপালন করিয়া আসিত। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুসমাজ হইতে আরম্ভ করিয়া নব খ্রীষ্টসমাজের ইতিহাসের গূঢ় তত্ত্ব সকল আলোচনা করিলে ইহাই দেখা যায়—শাস্ত্রের অভ্রান্ততা মানব সমাজে চিরকাল রক্ষা পায় নাই—তার নানারূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে—মানুষ তার নানারূপ বিকৃতি করিয়াছে। কোন শাস্ত্রের অভ্রান্ততা জগতে রক্ষা পায় নাই, পাইবেও না (৬ b)।

---

(৬) "Is there not in nature a perpetual competition of law against law, force against force, producing the most endless and unexpected variety of results." *Canon Kingsly.*

(6 a) See Dr. Rajendra Lall Mitra's speech on Hindu marriage customs. P. 86

(6 b) "There is no single code of morals which Humanity has not

তারপর কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্ব পুরুষের কথা বা আচার প্রণালী বা মানব সমাজের সম্মিলিত মত সমষ্টি প্রতিপালন করিলেই নীতি ও ধর্ম্ম রক্ষা পায়। ইহাও সত্য নয়। কারণ মানব চির উন্নতিশীল। উন্নতি ভুলিয়া কেবল পুরাতন লইয়া মানুষ থাকিতে পারে না। প্রকৃতি ক্রম-উন্নতিশীল, একভাবে চিরকাল থাকিতে পারে না (৭)। থাকিলে সময়ে সময়ে যে সকল মহাপুরুষ জগতে আবির্ভূত হইয়া পূর্ব্ব মতের আমূল সংস্কার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অভ্যুত্থানে তাহা হইলে বিধাতার ইচ্ছা থাকিত না।

অতএব দেখা যাইতেছে, অভ্রান্ত শাস্ত্রের কথাও সব সময়ে ঠিক নয়, সম্মিলিত মানব সমষ্টির মতেও ভুল থাকিতে পারে; আবার ব্যক্তিগত বিবেকেও মহাভুল থাকা সম্ভব (৮)। তবে মীমাংসা কোথায়? আমরা বলি, তিনই পবিত্র, এই তিনের মিলনেই উন্নতি। কেবল শাস্ত্র নয়, কেবল ব্যক্তিগত বিবেক নয়, কেবল মানব সমাজের মত নয়। তিনের মিলনে যাহা উৎপন্ন, তাহাই প্রতিপাল্য। পৃথকভাবে তিনের কার্য্য হওয়াতেই জগতে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে (৯)। সমাজের বিরুদ্ধে সমাজ, মানবের বিরুদ্ধে মানব, শাস্ত্রের বিরুদ্ধে শাস্ত্র মহা যুদ্ধ করিয়াছে। সেই

abandoned, after an acceptance and belief of some centuries, in order to seek after diffuse another more advanced than it." *Joseph Mazzini.*

(৭) "Mankind, always progressive, revolutionizes constitutions, changes, and changes, seeking to come close to the ideal justice, the divine and immutable law of the world, to which we all owe fealty, swear how we will." *Theodore Parker.*

(৮) "Evidently the voice of individual conscience does not suffice at all times, without any other guide, to make known to us the law." *Mazzini.*

"Conscience may be cultivated in an exclusive manner to the neglect of the affections. Then conscience is despotic; the man always becomes hard and severe &c. *Theodore Parker.*

(৯) "The common hitherto, has been the endeavour to reach truth by the help of one of these tests alone, an error fatal and decisive in its consequences because it is impossible to elevate individual conscience as the sole judge of truth, without falling into anarchy; and it is impossible to appeal, at a given moment, to the general consent of Humanity, without crushing human liberty, and producing tyranny." *Joseph Mazzini.*

যুদ্ধের আজও বিরাম হইল না। শাস্ত্র, বিবেক এবং মানবের সমবেত মত, এই তিনের মিলনে যাহা উৎপন্ন, তাহাই সত্য, তাহাই নীতি, তাহাই ধর্ম্ম (১০)। যে স্থলে তিনের মিল নাই, সেখানে আছে কেবল ঝগড়া বিবাদ কলহ! প্রাচীন হিন্দু সমাজ প্রাচীন শাস্ত্রের অভ্রান্ততা বজায় রাখিতে যাইয়া হতবল হইয়াছে—দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে—শাস্ত্রের অনন্ত-বিরোধী প্রতিপাল্য বিধান সকল পালনে অসমর্থ হইয়া মানুষ হাবুডুবু খাইয়া অবশেষে কদাচার এবং দুর্নীতির সেবা করিয়া কলঙ্কিত হইতেছে। আর নবীন ব্রাহ্ম-সমাজ ব্যক্তিগত বিবেকের স্বাধীনতার উপর অধিক ঝোঁক দিয়া দিন দিন ঘোরতর মতের বৈষম্য, ঝগড়া, কলহ বিবাদের সৃষ্টি করিয়া দলের পর দল বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃজন করিতেছে। কেবল কি তাহাই? না—তা নয়। পাপের পর পাপ, কলঙ্কের পর কলঙ্ক—সৃজন করিয়া সমাজকে তোলপাড় করিয়া ফেলিতেছে! এখানে আজকাল আর নাকি একজনের নীতি আর এক-জনের সহিত মিলেনা!! কি শোচনীয় অবস্থা! কেবল নিজের মঙ্গল সাধন করা যদি মানবের লক্ষ্য হইত, নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতাই যদি মানবের এক-মাত্র কর্ত্তব্য হইত, তবে বিবেকের কথা মতে চলিয়া যাইলেও অপরের কোন প্রত্যক্ষ (direct) ক্ষতি ছিলনা। এরূপ স্থলেও পরোক্ষ (indirect) ক্ষতি অপরিহার্য্য। কিন্তু যখন পরস্পরের উন্নতি বা মঙ্গল সাধন করা পরস্পরের লক্ষ্য, তখন মানব সমাজের নীতি, সত্য বা ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিতেই হইবে। যে কার্য্যে অপরের সহিত যোগ, যে কার্য্যে অপরের ক্ষতি, বিবেকের আদেশ পাইলেও, আমাকে তাহা হইতে বিরত থাকিতে হইবে। অন্যকে বধ করিতে আমার খেয়াল বা ইচ্ছা বিবেক স্থানীয় হইয়া, আমাকে উত্তে-জিত করিতে পারে, কিন্তু অন্যের অনিষ্ট স্মরণ করিয়া, মানব সমাজের নিয়ম স্মরণ করিয়া, আমাকে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেই হইবে। নচেৎ সমাজের মঙ্গল অসম্ভব (১১)।

(১০). "*Whensover thy agree*, whensoever the cry of your conscience is ratified by the consent of Humanity, God is there. Then are you certain of having found the truth, for the one is the verification of the other." * *

Joseph Mazzini.

(১১). "You are born with a tendency towards good, and every time you act directly contrary to the moral law, every time you commit what mankind has agreed to name sin, there is something that condemns you."

যে স্থলে সমবেত মানবের মতের সহিত ব্যক্তিগত বিবেকের অমিল হয়, সেখানে বাধ্য হইয়া মানুষকে সমষ্টিগত বিবেকের কথা মতে চলিতে হইবে, না চলিলে তাহাকে পৃথক থাকিতে হইবে। পৃথক থাকাতে মানব-শক্তি বিকাশের পক্ষে যথেষ্ঠ অন্তরায় আছে, সে ক্ষতি মানব সকল সময়ে সহিতে পারে না; সুতরাং বাধ্য হইঁয়াই সমবেত বিবেকের আদেশে তাহাকে চলিতে হইবে; বাধ্য হইয়াই সমাজে থাকিতে হইবে। বাধ্যবাধকতা না মানিলে সমাজ চলেনা। সমাজ ভিন্ন মানবের উন্নতি অসম্ভব; সুতরাং মানবও বাঁচে না। বাধ্যবাধকতাই জীবনের লক্ষ্য। ইহাকে ঘৃণা করিলে, ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েরই অপকার। তবে এমন কতক-গুলি স্থান আছে, যাহার সহিত সমাজের কোন সংস্রব নাই। সেস্থানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে রক্ষা করিয়া চলিতে দেওয়া একান্ত উচিত। আত্ম-সংযমে, চিন্তা শক্তির পরিচালনায়, লেখায় ও বক্তৃতায় মানবের স্বাধীনতা থাকা সম্পূর্ণ উচিত (১২)। আর অন্য স্থানে মানবের সমবেত শক্তির অধীন হইয়া চলাই মানুষের ধর্ম্ম। জগতে রাজাই এই সমবেত শক্তির বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। নানা কারণে শক্তির অপব্যবহারে, রাজশক্তি আমাদের দেশে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। যে বিদেশী রাজা নিজের স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত, সে কখনও সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। কাজেই আমাদের দেশে এখন ঈশ্বরের প্রতিনিধি একমাত্র সমাজ। এদেশে সমাজই নীতি ও ধর্ম্মরক্ষার একমাত্র সহায় (১৩)। সমাজবন্ধন না থাকিলে

"Yet this is the primary aim of morals and no individual can reach that aim by the light of conscience alone." *Joseph Mazzini.*

(১২). "Such is the spiritual freedom which Christ came to give. It consists in moral force, in self-control, in the enlargement of thought and affection, and in the unrestrained action of our best powers."
Channing.

(১৩). "The truth is that the moral and social reformation of India, as of any other country, if it is to be effective, must result from the action of internal forces. * * And this is why civilization through a foreign Government, the popularisation of Western ideas through official insistence, a system of education through officials employed under the Department of Public Instruction, must always fail." *H. J. S. Cotton.*

ধর্ম্ম ও নীতি বিশৃঙ্খল হয়, মানবসমাজ স্বেচ্ছাচারের অত্যাচারে ছারখার দশা প্রাপ্ত হয় (১৪)।

আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সমাজের অধিকারের সীমা নির্দ্ধারণে বোধ করি কতকটা কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি। যাহাতে নিজের ক্ষতি বৃদ্ধি, তাহাতে নিজের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। চিন্তায়, লেখায়, বক্তৃতায় ও আত্ম-সংযম প্রভৃতিতে স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। যাহাতে অপরের সম্বন্ধ, ইষ্টই হউক বা অনিষ্টই হউক, তাহাতে সমাজের অধীন হইয়া চলিতে হইবে। এরূপ স্থানে নিজের বিবেক মানিলে চলে না, অধর্ম্ম হয়। এরূপ স্থলে সমাজের নিয়ম প্রণালী মানা উচিত। সমাজের নিয়ম প্রণালী নির্দ্ধারণ কিরূপে হইবে? তাহাতে প্রাচীন এবং আধুনিক সমবেত বিবেকের স্বর থাকা প্রয়োজন (১৫)। যেখানে তাহা না থাকে, সেখানে ঘোর অবিচার এবং অত্যাচার হয়।

রাজশক্তি এক সময়ে পৃথিবীতে সমাজশক্তির কাজ করিত। কিন্তু কালক্রমে, ঘটনা পরম্পরায় রাজশক্তি হইতে সম্মিলিত মানব-বিবেকশক্তি পৃথক হওয়ায়, সে শক্তি ঘোরতর অত্যাচারী হইয়া মানব সমাজের ভয়ানক অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। এখনও যে সকল দেশে মানব সাধারণের সম্মতিতে রাজশক্তি উত্থিত হইতেছে, সে সকল দেশে সমাজের কার্য্য রাজার দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে বিদেশী রাজা আপনি উত্থিত—স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্মলক্ষ্যভ্রষ্ট,—প্রেমহীন, কঠোর, অত্যাচারী, কাজেই আমরা তাহার সমস্ত কথা প্রতিপালন করিয়া চলিতে ধর্ম্মত বাধ্য নই; এবং এই জন্যই বাল্যবিবাহ রহিত করিবার জন্য রাজদ্বারে আবেদন করিতে এদেশে অনিচ্ছুক। রাজারও তেমন শক্তি নাই যে, আমাদিগকে সব বিষয়ে বাধ্য করিতে পারে (১৬)।

---

(১৪). "I say, then, that society is throughout a moral institution * * Society is of earlier and higher origin. It is God's ordinance, and answers to what is most godlike in our nature." *Channing.*

"Every highly orgainised person knows the value of the social barriers, since the best Society has often been spoiled to him by the intrusion of bad companions." *Emerson.*

(১৫). "Its tendencies must be moulded by the accumulated influence of the past and by the direct action of the present." *H. J. S. Cotton.*

(১৬). "There has been a foolish neglect of moral culture throughout

এখন তেমন শক্তি আছে—কেবল সমাজের সমবেত বিবেকশক্তির। সমাজের এই বিবেকশক্তির শাসন ভিন্ন মানবের দুর্নীতি-পরায়ণতা নিবারণের আর উপায় নাই। কেহই ইহার উপকারিতা অস্বীকার করিতে পারেন না। এই সমবেত বিবেকশক্তি আধুনিক হিন্দুসমাজের মধ্যে কার্য্য করিতে পারিতেছে না বলিয়া, পতনের পথ ক্রমেই উন্মুক্ত হইয়া আসিতেছে। ক্রমেই সে সমাজ-বন্ধন শিথিল হইতেছে। দিন দিন ব্যবসায়ী পুরোহিতদিগের স্বেচ্ছা ও খেয়ালের সামগ্রী হইয়া হিন্দু-সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি এবং আচার প্রভৃতি ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে (১৭)। তর্কের খাতিরে যিনিই যাহা বলুন না কেন, এ কথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি এদেশের একমাত্র আশা ছিল। আশা ছিল, এক সময়ে এই সমাজ সমবেত-বিবেকশক্তির লীলা-ক্ষেত্র হইয়া, এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশকে ভয়ানক দুর্নীতি-পরায়ণতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবে। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, সে সমাজ ব্যক্তিগত বিবেক-প্রাধান্য ঘোষণায় দিন দিন অহঙ্কার ও স্বেচ্ছাচারের লীলাভূমি হইয়া উঠিতেছে। আমি বড়, আমি বড়,—আমায় দেখ, আমার কথা শুন, এইরূপ অহঙ্কারের কথা চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হইতেছে। কেবল স্বাধীনতায় যে চলে না, সাধারণের কথা দূর হউক, নেতাদের মধ্যেও এ কথা এখনও অনেকে বুঝিতেছেন না। সমাজকে আদর্শ নীতিসম্ভূত আচার প্রণালী ও অনুষ্ঠানাদিতে ভূষিত করিয়া দাঁড় করাইতে না পারিলে দেশের আর মঙ্গল নাই (১৮)। সমবেত বিবেক-শক্তি-সিংহকে জাগাইতে না পারিলে—এ সমাজও অচিরে অশিক্ষিত বৈষ্ণবসমাজ বা কর্ত্তাভজা সমাজের ন্যায় ঘৃণিত হইয়া উঠিবে।

all Christendom. * * The thrones of Christain Europe tremble, a little touch and they fall." *Theodore Parker.*

(১৭) "They justify the popular sins in the name of God."
Theodore Parker.

(১৮) "Virtue and wisdom without forms are like foreign tongues which are not understanded of the people." *Bacon.*

"It is meritorious to insist on forms. Religion and all else naturally clothes itself in forms." *Carlyle.*

আমরা সম্মিলিত বিবেকশক্তির দ্বারা নিয়ম গঠনের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি, একথা ব্যক্ত করিতে আমরা সঙ্কুচিত হই নাই। ইহা করা নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত (১৯)। কিন্তু সে নিয়ম যত অল্প এবং যত স্পষ্ট হয়, ততই ভাল। নিয়মবাহুল্যেও সমাজের ভয়ানক অপকার হয় (২০)। পরন্তু এই নিয়ম গঠনের সময় একমাত্র প্রেমের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। কিসে লোক শাস্তি পাইবে, সে দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, কিসে লোক ভাল হইবে, এই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শাস্তির বিধান যে রাখিতেই হইবে, এমনও কোন কথা নাই। কি প্রণালীতে সকলকে চলিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিলেই যথেষ্ট হইল। সমাজের লোকের পক্ষে কি প্রতিপাল্য, ইহা নির্দ্ধারণ করিলেই যথেষ্ট হয়। যাহারা তাহা প্রতিপালন না করিবে, তাহাদিগকে সমবেত বিবেক-শক্তি নীরবে শাসন করিবে। সে শাসনের দুর্জ্জয় শক্তি। প্রেমের দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানব সমাজ যে বিধি প্রণয়ন করে, তাহা প্রতিপালনে লোকের যেমন ইচ্ছা হয়, শাস্তির ভয়ে সেরূপ হয় না। রাজ-আইনে শাস্তির বিধান যথেষ্ট আছে, তবু মানুষ কিন্তু পাপকার্য্য করিতে ছাড়ে না (২১)। প্রেমের দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানবসমাজ যে নিয়ম প্রণালী নির্দ্ধারণ করেন, তাহা পালন করিতে মানুষের স্বতঃই প্রবৃত্তি জন্মে। তার ভিতরে কি যেন একটা স্বর্গের বাণী লুক্কায়িত থাকে। তার ভিতরে কি যেন একটা মহৎ ভাব থাকে, যাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া মানুষ কোন মতেই চলিতে পারে না (২২)। এই নিয়ম প্রণালী প্রণয়নে সম্মিলিত বিবেকের অধিকাংশের মত থাকা চাই। সমবেত বিবেক যেখানে, সেই খানে বিধাতা স্বয়ং বর্ত্তমান। বিধাতার কার্য্য, বিধাতার নীতি, এইরূপে মানবসমাজের দ্বারাই নির্দ্ধারিত

---

(১৯) "The wisdom of legislation seen in grafting laws on conscience." *Channing.*

(২০) "For this end, laws should be as few and simple as may be; for an entensive and obscure code multiplies occasions of offence." *Channing.*

(২১) "Arbitrary and oppressive laws invite offence, and take from disobedience the consciousness of guilt." *Channing.*

(২২) "But disinterested benevolence can find other instruments to persuade people to their good, than whips and scourges, either of the literal or the metaphorical sort." *John Stuart Mill.*

এবং রক্ষিত হয় (২৩)। কেবল তাহা নয়, যতদূর সম্ভব, মানবের অতীত সমবেত বিবেক-শাস্ত্রের সম্মতির সহিত মিলিতে চেষ্টা করা উচিত। এ সম্বন্ধে মনুসংহিতা খুব সহায়তা করিবে। এরূপ গ্রন্থ অতি অল্প আছে। সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে এ পর্য্যন্ত তেমন কোন চেষ্টা হয় নাই বলিয়া, আমরা যে কেবল দুঃখিত, তাহা নয়; এই জন্যই সমাজে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা যাই-তেছে। যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে; এখন বিনীত অনুরোধ, যত শীঘ্র হয়, একটা কিছু নিয়ম প্রণালী ঠিক হউক।

ব্রাহ্মসমাজের গত ৫০ বৎসরের ইতিহাসে ইহাই দেখা যায়, এই সমাজ হিন্দুসমাজের সামাজিক আচার প্রণালীর প্রতিবাদেই অধিক সময় অতি-বাহিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে যে সামাজিক আচার প্রণালী প্রবর্ত্ত করার প্রয়োজন হইবে, মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময়ে এ বোধ তত জন্মে নাই। তখন সামাজিক প্রশ্নের অতি অল্পই আলোচনা হইত। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সময়ে এসম্বন্ধে প্রথম আলোচনা উঠে এবং ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠানের প্রথম সূত্রপাত হয়। কিন্তু তাঁহার কন্যার বিবাহের পর অল্পে অল্পে তাঁহার মনে একটু সঙ্কোচ ভাব উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, এই আশঙ্কায় তিনি পশ্চাৎপদ হই-লেন (২৪)। মহাত্মা কেশবচন্দ্র দলবল লইয়া কাজেই আদিসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং মহাত্মা কেশবচন্দ্রের সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের অনু-ষ্ঠানের রীতিমত সূত্রপাত হয়। এবং সেই সময় হইতে এ সম্বন্ধে অনেক কার্য্য আরম্ভ হয়। আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, হিন্দু সমাজের কুপ্রথা সকল ভাঙ্গি-বার জন্য ব্রাহ্মসমাজ প্রথমে খুব ব্যস্ত ছিলেন (২৫)। কিন্তু সুপ্রথাগুলি সুপ্রণালীতে যাহাতে সংস্থাপিত হয়, তৎপক্ষে তত ব্যস্ত ছিলেন না। স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা দিতে হইবে, বিধবা বিবাহ দিতে হইবে, বাল্য বিবাহ ও জাতিভেদ ভাঙ্গিতে হইবে,যৌবনবিবাহ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে;—তখনকার

(২৩) But in human affairs the Justice of God must work by human means." *Theodore Parker.*

(২৪) "Faith and Progress of the Brahmo Somaj. Page 289, 200 and 291.

(২৫) "The Brahmo Somaj has absorbed the spirit of the ancient Hindu religion and left to those outside its dead, dry, and meaningless forms only. &c. *P. C. Mozoomdar.*

প্রধান চেষ্টা এইরূপ ছিল। এই সকল প্রচলিত না হইলে দেশের, সমাজের এবং মানবের যে অপকার হয়, সেই আলোচনাই অধিক হইত, কিন্তু এ সকল প্রবর্ত্তিত করিলে কোন অপকারের সম্ভাবনা আছে কিনা, এ সকল কি প্রণালীতে প্রবর্ত্তিত করিলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা, বাস্তবিক এ সকল প্রথায় কোন অপকার আছে কিনা, এই সকল গভীর তত্ত্বের আলোচনা বা মীমাংসা তত হইত না। স্ত্রীশিক্ষা দিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, কি উপায়ে স্ত্রীশিক্ষার কুফল নিবারিত হয়, স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে ইহার অবশ্যম্ভাবী কুফল হইতে সমাজকে রক্ষা করার জন্য কি কি করা উচিত;—বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিলে ও বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিলে সমাজের কোন অপকারের সম্ভাবনা আছে কিনা, এ সকল বিষয়ের বিশেষ কোন আলোচনা হইত না। বাস্তবিক পৃথিবীতে সচরাচর এই রূপই ঘটিয়া থাকে। নূতন কিছু প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় সেই নূতনে কিন্তু ভুল ভ্রান্তি আছে কিনা, সকল সময়ে মানুষ তাহা দেখিতে পায় না। প্রাচীন প্রথার মধ্যে কোন কিছু ভাল আছে কি না, নূতন প্রথায় কোন ভুল আছে কি না, ইহা না ভাবার দরুণ সমাজের ভয়ানক অনিষ্ট হয়। বাস্তবিক উভয় দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা উচিত (২৬)। প্রাচীন কুপ্রথা সকল ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ কর, তখনকার ব্রাহ্মসমাজে প্রধান কথা এইরূপ ছিল, নূতন প্রথার দোষ আলোচনার তখন অবসর ছিল না। কারণ, ব্রাহ্মসমাজ তখনও একটা সমাজের আকার ধারণ করে নাই। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে ব্রাহ্মসমাজে নূতন অনুষ্ঠান সকল আরম্ভ হইল। বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করা উচিত, আদর্শ সমাজ গঠন না করিতে পারিলে, আদর্শ নীতি সকল জীবনে পালন করিতে না পারিলে এই সকল নব প্রথা টিকিবে না,—তখন অনেকের মধ্যে এই চিন্তা উঠিল। কাজেই নূতন নূতন অনুষ্ঠান ক্রমাগত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে হিন্দু সমাজে থাকিয়াই অনেকে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগ দিত,

(২৬). "On the part of men eager to rectify wrongs and expel errors, there is still, as there even has been, so absorbing a consciousness of the evils caused by old forms and old ideas, as to permit no consciousness of the benefits these old forms and old ideas have yielded." * * But while this one-sidedness has to be tolerated, as in great measure unavoidable, it is in some respects to be regreted." *Herbert Spencer.*

ক্রমে 'আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম' নামে একটা কথা উঠিল। চতুর্দ্দিকে আন্দোলন উপস্থিত হইল;—ঘোরতর আন্দোলন। বিবাহ বিষয়ে নূতন আইন পর্য্যন্ত বিধিবদ্ধ হইল। এই সময়েও কিন্তু আচার ও ব্যবহার প্রণালী প্রভৃতি স্থিরীকৃত হইল না। গোলে হরিবলেই অল্পে অল্পে বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠান নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। যৌবনবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ—সমস্তই প্রচলিত হইল। ক্রমেই সমাজ জাঁকিয়া উঠিল। এই সময়ে দুই একটা কলঙ্ক রেখাও দেখা যাইতে লাগিল। ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া একান্তবর্ত্তী পরিবার গঠনের খুব চেষ্টা হইল, কিন্তু কি কুক্ষণে কে জানে, সকল দিকেই একটু একটু কি যেন বিষম কাল মেঘ দেখা যাইল। ব্রাহ্মসমাজের তদনীন্তনের বিজ্ঞ নেতা একটু ভীত হইলেন। তিনি কোনরূপ একটা শক্তি দাঁড় করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা সফল হইল না। বিবেক-স্বাধীনতা তখন এত প্রচারিত হইয়াছে যে, ক্যাথলিক খ্রীষ্ট সমাজের ন্যায় কোন শক্তিকে মান্য করিয়া চলা উচিত, এই সরূপ প্রবন্ধ প্রকাশ্য পত্রিকায় লিখিত হইলেও, অনেকে তাহার বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতে লাগিল। কোন শক্তিই প্রতিষ্ঠিত হইল না, কোন নিয়ম-প্রণালীই স্থিরীকৃত হইল না। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে আবার নূতন প্রতিবাদ-তরঙ্গ উঠিল—কুচবেহার বিবাহের আন্দোলন চলিল। পূর্ব্বে প্রতিবাদ ছিল, বাহিরের সমাজের সহিত,—এবার ঘরে ঘরে। সমাজ বিচ্ছিন্ন হইল, নিয়মতন্ত্র-প্রণালী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইল। তাহা হইলও। কিন্তু হায়, সামাজিক বিষয়ে যে উদাসীনতা, সেই উদাসীনতাই থাকিয়া যাইল! যে সকল নিয়ম হইল, সে সকলই বাহিরের ব্যাপার—তাতে নিগূঢ় সমাজতত্ত্বের কিছুই মীমাংসা হইল না। নববিধান সমাজের নেতা তখন বুঝিলেন, এ ভাবে ব্রাহ্মসমাজ চলিলে, অচিরাৎ এ সমাজ বিলয় প্রাপ্ত হইবে। আদর্শ নীতি বা কর্ত্তব্য সকল যদি স্থিরীকৃত না হয়, এবং তাহা যদি সমাজের ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিপালিত না হয়, তবে ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা মানব সমাজের কিছুই মঙ্গল হইবে না। পুরাতন প্রথা তুলিয়া দিবার পূর্ব্বে, নূতন প্রথা সংস্থাপনের সুশৃঙ্খল নিয়মপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত না করিলে যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটে, ব্রাহ্মসমাজেও তাহাই হইল (২৭)। বাল্যবিবাহ রহিত হইয়াছে,

---

(২৭) "Just as injurious as it would be to an amphibian to cut off its branchiæ before its lungs were well developed, so injurious must it be to

কিন্তু সকল যৌবনবিবাহ ধর্ম্মনীতিকে রক্ষা করিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হইতে পারিল না, নানা ক্রটী দেখা যাইতে লাগিল। ইহা বুঝিয়া তিনি খুব চিন্তিত হইলেন। ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, এ সকল বিষয়ে সমাজের লোকের বড় দৃষ্টি নাই, তিনি আরো চিন্তিত হইলেন। কত আক্ষেপ করিয়া, কত দুঃখ করিয়া বন্ধুদিগকে এই সময়ে বলিতে লাগিলেন, "আমি যাহা করিতে চাহিয়াছিলাম, সেরূপ তোমরা কিছুতেই হইলে না।" সাময়িক প্রার্থনা উপাসনাতেই বা কত আক্ষেপ ব্যক্ত করিলেন। সম্প্রতি তাঁহার একটী সুন্দর প্রার্থনা নববিধান পত্রিকা হইতে প্রতাপবাবু-বিরচিত কেশবচন্দ্রের জীবনীর ৪৭১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক চিন্তার পর, অনেক মর্ম্মবেদনার পর অবশেষে এই সকল অরাজকতা হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি নবসংহিতা প্রণয়ন করিলেন, এবং দরবার প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টিত হইলেন। নবসংহিতা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তিনি লিখিলেন ;—The New Samhita will be shortly ready, and a day ought to be appointed for its formal promulgation among our people,—a day that will close the epoch of anarchy, self-will, and lawlessness, and usher in the kingdom of law, and discipline, and harmony." ইহাতেই বুঝা যায়, তিনি সমাজের সেই সময়ের অবস্থা কি সুন্দর রূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু দারুণ চিন্তার পর তাঁহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িল, হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। নবসংহিতা তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর দরবার নববিধান-সমাজে নবসংহিতা অনুসারে কার্য্যাদি চালাইতেছেন। এইত গেল ব্রাহ্মসমাজের এক বিভাগের ইতিহাস। ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ বিভাগ সভা সমিতি সম্বন্ধীয় যথেষ্ট আইন কানুন করিতে তৎপর হইলেন বটে, কিন্তু সামাজিক ব্যাপারাদি সম্বন্ধে কিছুই নিয়ম হইল না। নিয়ম হইল না বটে, কিন্তু অপরাধীর বিচারের জন্য একটী সামাজিক বিচার-কমিটী নিয়োগ হইল। কি করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে সমাজের কোন আদেশ নাই, কিন্তু বিচারের খুব ঘনঘটা। এরূপ খাম্‌খেয়ালি বিচারের ভয় করিয়া কে চলিবে? সুতরাং নিরাশার পর আরো নিরাশা—কালিমার পর আরো কালিমা দেখা যাইতে লাগিল। অল্প-

---

a society to destroy its old institutions before the new have become organized enough to take their places." *Herbert Spencer.*

বয়স্ক লোকের সংখ্যা অধিক প্রযুক্তই হউক, বা ধর্ম্মহীনতা প্রযুক্তই হউক, বা অধিক সংখ্যক লোকের সমাবেশ বলিয়াই হউক, ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ বিভাগে কালিমার রেখা কিছু বেশী জমাট বাঁধিল! আর আর সমাজ ক্রমে ক্রমে একটু নিয়মাদির সঙ্কীর্ণতারূপ (?) গণ্ডির দিকে ঝুঁকিল,—কিন্তু সাধারণ বিভাগ সর্ব্ব বিষয়ে অগ্রণী হইয়া প্রতিবাদের মূল নিশান হস্তে লইয়া, দীর্ঘ বক্তৃতাকণ্ঠী হইয়া, সমর ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন। এ সমাজে কোন নেতা নাই। কিন্তু অস্পষ্ট ভাবে যদি কোন নেতার কল্পনা করিয়া লওয়া যায়, তবে সেই নেতা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—“বিবেকের স্বাধীনতা ঘোষণা কর।” * * * “মনুসংহিতাকে কর্ম্মনাশার জলে ফেলিয়া দেও।” ইহার ফল যাহা হইবার, তাহা অবাধে ফলিতে লাগিল। বিবেকে বিবেকে তুমুল সংগ্রাম চলিল। যেমন কেহ বলেন,—চুম্বন, আলিঙ্গন বিবেকের আদেশ; কেহ বলেন, সম্বন্ধ-পাতানে ভগ্নী ইত্যাদির সহিত বিবাহিত হইলে নীতি-বিরুদ্ধ হয় না, আর কেহ কেহ ইহার বিরুদ্ধেও বলেন। সামাজিক কোন বিষয় মীমাংসার জন্য কখনও কোন সভা হয় নাই, তাহা নয়; অনেকবার হইয়াছে। কিন্তু যখনই হইয়াছে,—দুই দলে বিষম সংগ্রাম হইয়াছে, কোন্‌টা নীতি, কোন্‌টা নয়, ইহা স্থিরীকৃত হয় নাই। গানে বা বক্তৃতায় আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ পায় নাই, তা নয়, কিন্তু জীবনে হায়, জীবনে অতি অল্প। এইরূপ ভাবে ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান সময়ে এক কঠিন সমস্যার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সে সমস্যা এই, এখন কি করা উচিত? আধ্যাত্মিকতার হীনতা হইতে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায়, এজন্য অগ্রণীগণ খুব চিন্তিত হইলেন, এবং চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। আমাদের প্রতিবাদকারী এক ব্যক্তি উল্লেখ করিয়াছেন, “গত কয়েক মাস হইতে সামাজিক বিষয়ের আলোচনা হইতেছে *।” বলা বাহুল্য, সে সকল আলোচনা, যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ নামক প্রবন্ধ নব্যভারতে প্রকাশের পর উঠিয়াছে। যাহা হউক, সে সকল সভাতেও যদি কিছু একটা নির্দ্ধারিত হইত, সুখের সীমা থাকিত না। কিন্তু তাহা হইবার নয়। সব দল প্রবল। সব মত প্রবল। সকলের বিবেক স্বাধীন—শিশুও স্বাধীন, বৃদ্ধও স্বাধীন! শিক্ষকও স্বাধীন, উপদিষ্টও স্বাধীন। ইহা ছাড়া আবার ভয় ভাবনা আছে। অমুক লোকটাকে কিছু বলিলে, সে

* নব্যভারত, পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয় তৃতীয় সংখ্যা।

চটিবে; বড় আশঙ্কা! এইরূপ ভয় ভাবনায় এবং এইরূপ স্বাধীনতার ধাক্কায়, আমরা দেখিলাম, ক্রমে ক্রমে প্রবীণ প্রবীণ ব্যক্তিরাও নীরব-প্রকৃতির হইতে লাগিলেন। দেখিলাম, তাঁহারাও দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতেছে দেখিলেও আর কথা বলেন না। এইরূপে বর্ত্তমান বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবের অবতারণার আশুকতা আমরা বুঝিলাম। আমাদের আলোচনা আরম্ভ হইবার পর চতুর্দ্দিকে প্রাচীন বিবাহ প্রথার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে—নূতন প্রথা এবং পুরাতন প্রথা উভয়েরই দোষ গুণ আলোচনা হইয়াছে। বাস্তবিক উভয় প্রথাকে তলাইয়া না দেখিলে, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, কঠোর রূপ পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে, কিছু মঙ্গলের আশা থাকে না। এই জন্য, উভয় পক্ষের অগ্রণী ব্যক্তিগণেরই, উভয় দিকের সত্যাসত্য ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত (২৮)। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, প্রাচীন আচার প্রণালীর পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ নূতন প্রথায় কোন সত্য আছে কি না, তাহা দেখিতে প্রস্তুত নন্; আবার নূতন প্রথা-প্রতিষ্ঠাকারী সম্প্রদায়ও প্রাচীন প্রথার সত্য এবং নূতন প্রথার ভুলভ্রান্তি আলোচনায় মনোনিবেশ করিতে চাহেন না। ইহাতে প্রাচীন হিন্দু এবং নবীন ব্রাহ্মসমাজ উভয়েরই ঘোর অনিষ্ট হইতেছে। ইহা বুঝিয়া আমরা নীরব থাকিতে পারিলাম না। বুঝিলাম, ব্রাহ্মসমাজকে কেবল একটা প্রাচীন সমাজের প্রতিবাদ স্বরূপ দাঁড় না করিয়া, ইহাকে ধর্ম্ম এবং নীতিতে ভূষিত করিয়া দাঁড় করান উচিত। ব্রাহ্ম এখন সমস্ত দেশময় পরিব্যাপ্ত। এই দেশময় পরিব্যাপ্ত ব্রাহ্ম-সাধারণ এ সকল বিষয় একবার চিন্তা করেন, আমাদের বিনীত অনুরোধ। অনুরোধ, তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়া ব্রাহ্ম-সমাজকে ঘোরতর অরাজকতা হইতে উদ্ধার করেন। না করিলে এ সমাজের আর মঙ্গল নাই। বিবাহ প্রশ্নের সুমীমাংসা না হইলে এ সমাজ দুর্নীতির প্রবল স্রোতে অচিরে ডুবিয়া যাইবে। পাশ্চাত্য সমাজের শিথিল-বিবাহ-প্রথা এ দেশের আদর্শ হইবে। হায়, তাহা হইলে আর অবনতির বাকী রহিল কি?

---

(২৮) "Hence the need for an active defence of that which exists, carried on by men convinced of its entire worth so that those who attack may not destroy the good along with the bad." *Herbert Spencer.*

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হিন্দুশাস্ত্র যৌবনবিবাহের অনুকূল কি না ?

আমরা সপ্তম পরিচ্ছেদে সামাজিক নিয়মাদি থাকা যে একান্ত উচিত, তাহা একরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছি। পরস্পরের সহিত যে সকল কার্য্যে যোগাযোগ, অর্থাৎ যাহাতে পরস্পরের ইষ্টানিষ্ট ঘটে, সে সকল কার্য্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করা একান্ত উচিত। ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য সামাজিক সময়োচিত নিয়মাবলী গঠন করা একান্ত প্রয়োজন *। নিয়মাবলী গঠনের সময় প্রাচীন এবং নূতন প্রথার দোষগুণ উভয়ই ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত †। বর্ত্তমান সময়ে বিবাহ বিষয়ক সমস্ত নিয়মাদি ধার্য্য করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজকে বিশেষ ভাবে চিন্তা করা উচিত। সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ প্রধানতঃ এখন তিন ভাগে বিভক্ত। এক সমাজকে অন্য সমাজের দোষগুণের ফলভোগী হইতে হইতেছে যখন, এবং আদান প্রদান কার্য্য এই তিন সমাজের লোকের মধ্যেই চলিতেছে যখন, তখন এই তিন সমাজকেই বিবাহ বিষয়ক নিয়মাদি গঠনের জন্য একত্রিত হইতে হইবে। তিন সমাজের মধ্য হইতে প্রবীণ, চিন্তাশীল, ধর্ম্মপিপাসু ও চরিত্রবান ব্যক্তি সকলকে লইয়া একটী সামাজিক-নিয়ম-গঠন-কমিটী নিয়োগ করিতে হইবে। তাঁহাদের নির্দ্দেশানুসারে যে সকল নিয়ম স্থিরীকৃত হইবে, তাহা অবনত মস্তকে সকলকে পালন করিতে হইবে। আপন আপন মত ও দল বজায় রাখিয়া চালতে চেষ্টা করিলে ব্রাহ্মসমাজের ভয়ানক অনিষ্ট হইবে। এই গুরুতর এবং অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহের সময় তিন সমাজ যদি একত্রিত হইতে না পারেন, তবে ব্রাহ্মসমাজকে, আজ হউক, কাল হউক, পাপের ভয়ানক ভ্রূকুটীর নিকট মস্তক অবনত করিতে হইবে,—পাষণ্ডীদিগের আধিপত্যে সমাজ ছারখার যাইবে।

এই সকল কথা না বুঝিয়া কেহ কেহ বলেন যে, "যাহারা দোষী, তাহাদিগের নাম প্রকাশ কর, তাহাদিগকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দিলেই ত সব গোল চুকিয়া যায়!" এইরূপ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের

---

* Guizot's History of Civilization. Vol 1. Page 13 & 14.

† The study of Sociology by Herbert Spencer. Page 399.

মধ্যে প্রধানতঃ দুই শ্রেণী দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণী সরলপ্রাণ, তাঁহারা তত গোলমাল বুঝেন না, মনে করেন, নাম বলিয়া দিলেই সব গোল চুকে। আর এক শ্রেণী কিন্তু বিষম চক্রী। তাহারা দোষী ব্যক্তিদিগের নাম বাহির করিতে পারিলে লাইবেল আনিবার সুযোগ পায়। এই উভয় শ্রেণীর লোকদিগের প্রতি আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা যেন মনে রাখেন যে, ব্যক্তিগত অপরাধ ও দোষের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা করা আইনবিরুদ্ধ এবং আমাদের ইচ্ছা-বিরুদ্ধ। সকল সমাজেই অপরাধী ব্যক্তি আছে এবং থাকিবে। সমাজ হইতে পাপ একেবারে নির্ম্মূল হইবে, কখনও আশা করা যায় না। এ পর্য্যন্ত কোন সমাজ একেবারে পাপ-শূন্য বা পাপী-শূন্য হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজেও পাপ আছে, পাপী আছে। এটা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয়। এ স্বতঃসিদ্ধ কথা শুনিয়া খুব বিরক্ত হইলেই বা চলিবে কেন? প্রত্যেকের জীবন আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাই—কোথায় ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ, আর কোথায় আমরা অধঃপতিত! ব্রাহ্মসমাজের কলঙ্ক বা কালিমার কথা আমরা কীর্ত্তন করিতেছি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহা কে না জানে? তোমরা সকলে জান না, না যাহারা বাহিরের লোক, তাহারা জানে না? মেকি টাকা পৃথিবীতে অধিক দিন চলে না। দু দশ দিন পরে তাহা ধরা পড়িবেই পড়িবে। ব্রাহ্মসমাজ এবং হিন্দুসমাজ, সকল সমাজেই পাপ আছে, এবং পাপী আছে। তাহা বাহিরের এবং ঘরের অনেক লোকই জানে। না জানিলেও সময়ে জানিবে। ইহাতে ক্ষোভ বা দুঃখ কি? দুঃখ এই, এ সম্বন্ধে সমাজ কথা বলেন না। দুঃখ এই, সমাজ পাপকে প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দেন। হিন্দুসমাজ বেশী প্রশ্রয় দেন, কি ব্রাহ্মসমাজ বেশী প্রশ্রয় দেন, সে বিচার করিতে চাহি না। আমরা এই মাত্র জানি, হিন্দুসমাজও প্রশ্রয় দেন, ব্রাহ্মসমাজও দেন। হিন্দুসমাজ এখন বিশাল-বিস্তৃত, ইহা হইতে দোষ বা পাপ উন্মূলিত করা এখন সোজা কথা নয়। যখন প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের কথা, বেদ বেদান্তের আপ্তবাক্য পর্য্যন্ত উপেক্ষিত হইতেছে, তখন কে এমন আছেন, যাঁহার কথায় বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের আমূল সংশোধন বা সংস্কার হইবে? কোটী কোটী দলে বিভক্ত হিন্দুসমাজ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া, আচার প্রণালী ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। তাঁহারা ধন্য, যাঁহারা এই প্রাচীন সমাজের সংস্কার বা সংশোধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টার ফল যে কি

হইবে, কিছুই নির্দ্দেশ করিবার শক্তি নাই। হিন্দুসমাজের এই শোচনীয় অবস্থার দিনে, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমাদের একমাত্র আশা ভরসা। হিন্দুসমাজ, ব্রাহ্মসমাজে সংযুক্ত হইয়া যাইবে, আমরা তাহা মনে করি না। তাহা কখনই সম্ভব নয়। সম্ভব—ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন। অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের জীবন্ত ভাব, চরিত্র, জীবন্ত সত্য হিন্দু-সমাজে যাইয়া সংযুক্ত হইবে। হিন্দুসমাজ যেখানে আছে, সেইখানে থাকিয়া অল্পে অল্পে পুনর্জীবন লাভ করিবে। আমরা ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে করি। কিন্তু যে আদর্শে প্রাচীন সমাজের সংস্কার হইতে পারে, সে আদর্শ পাইতেছি না, বরং স্থানে স্থানে দেখিতেছি, সাপ মারিতে গিয়া লাঠীই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। একটা পাপ নির্ম্মূল করিতে যাইয়া আর একটা পাপের অনুষ্ঠান হইতেছে। এমনই অবস্থা হইয়া উঠিতেছে যে, জীবন্তচিন্তা, জীবন্তভক্তি, জীবন্তবিশ্বাস ও সাধনাবিহীন অসারত্বে যেন সমাজ পূর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অন্য সমাজকে আদর্শ দেখাইয়া আকৃষ্ট করিবেন, দূরে যা'ক, নিজেরাই পরস্পরের ব্যবহারের পূতিগন্ধে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতেছেন। * মুর্খের বক্তৃতায় বা জীবনহীনের অসার কথায় লোক ভুলে না। ব্রাহ্ম-সমাজের অনেকেই বক্তা, অনেকেই না পড়িয়া পণ্ডিত বা অনেকেই সাধন ভজন না করিয়াও প্রচারক! সমাজে বক্তৃতা খুব জীবন্ত আছে, কিন্তু প্রকৃত নীতিমান ও চরিত্রবান লোক কই? যাঁহারা চরিত্রবান্ লোক বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের দৈনিক কার্য্য ও ঝগড়া বিবাদ দেখিলে দুঃখে হৃদয় অবসন্ন হয়। যাঁর মুখের জ্যোতিতে লোক পবিত্র হয়, যাঁর চরিত্রের সুবা-তাসে লোক ধার্ম্মিক হয়, সেরূপ লোক কই? মুখ ভার করিয়া গম্ভীর হইলে, বা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া, একদল চরিত্রহীন বালকের সাহায্যে, বিরোধী লোকের প্রতি নৈতিক-ঘৃণা (moral indignation!) দেখাইলেই ধর্ম্ম বা চরিত্র লাভ হয় না। আজি কাল পরস্পর দ্বেষাদ্বেষী হিংসাহিংসী করিয়া পরস্পারের বুকের রক্ত পান করিয়া সকলে মরিতেছে। সমাজে আদর্শ মত এখন আর জীবিত নাই। একজন, দুজন, দশজন লোক দোষী হইলে তবু কথা ছিল, কিন্তু দেখা যাইতেছে—অনেকেই কোন না কোন প্রকার দোষে লিপ্ত। আমি, তুমি, সে, কে দোষী নয়?—কাহার নাম করিব? নাম করিলেই বা বিচার করিবে কে? যে সকল ঘটনা জান, তার এক-

* Life and Teachings of Keshub Chunder Sen, Page 19.

টীরও ত বিচার কর নাই! বিচার হইবেই বা কিসের? একটা আদর্শ মত থাকিত, তবে বুঝিতাম, তাহার অন্যথা যে করিয়াছে, তাহাকে শাসন করা যাইবে, সুতরাং তার নাম করি। আদর্শ মত নাই যখন, দোষীর দোষ কেমনে সাব্যস্ত হইবে? একজন বলিতেছেন, "সম্বন্ধ-পাতা'নে ভাই ভগ্নীর সহিত বিবাহ হইতে পারে;—অন্য জন বলিতেছেন, বিবাহের পূর্ব্বে এক বাড়ীতে অভিভাবকহীন অবস্থায় থাকিলেই বা দোষ কি!" পাঠক, বলত, এ সকল কার্য্য নীতি-বিরুদ্ধ কি না? তোমার মতে অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু তার মতে ত নয়! সুতরাং তাহার দোষ বিচার করিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিবে কিরূপে? আমরা দেখিতেছি, সামাজিক বিচার-কমিটী থাকা সত্ত্বেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে শক্তিশালী পাপীর বিচার হইতেছে না। একজন ফরিয়াদী হইয়া উপস্থিত না হইলে বিচার আরম্ভ হয় না। ফরিয়াদী হওয়া কি কষ্টকর, ইহাতে কিরূপ হিংসার তলে পড়িতে হয়, সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং ফরিয়াদী হইতে বড় কেহ রাজী নয়। এইজন্য সুবিচার হওয়াও সম্ভব নয়। বিশেষত, স্বেচ্ছাচারমূলক বিচারকে লোকে ভয় করে না। এই সকল কারণে আমরা বারম্বার অনুরোধ করি, অগ্রে আদর্শমত গঠন করা উচিত। এ সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিয়াছি, আর বলিবার প্রয়োজন নাই। এই মাত্র বলি, এই আদর্শমত গঠনের জন্য তিন সমাজের একত্রিত হইয়া কার্য্য করা উচিত। আদর্শমত যখন প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন অনায়াসে পাষণ্ডীদিগকে দমন করা যাইবে এবং ব্যক্তিগত জীবনকে আদর্শমতে দীক্ষিত করিয়া উন্নত করা যাইবে। এইরূপ করিতে করিতে যখন ব্রাহ্মসমাজ নীতি ও ধর্ম্মে সজীব হইবে, তখন অলক্ষিত ভাবে এই জীবন্ত ভাব দেশময় সংক্রামিত বা অনুপ্রাণিত হইবে।

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, প্রাচীন প্রথা-সংস্থাপনকারী এবং নূতন প্রথা-প্রতিষ্ঠাকারী উভয় সম্প্রদায়ের ভাল মত উভয় সম্প্রদায়ের গ্রহণ করা উচিত। সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের সম্মিলিত সামাজিক কমিটী গঠিত হইলে তাহাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইবে, প্রাচীন প্রথার দোষ গুণ আলোচনা করা। এই কার্য্যের সহায়তার জন্য আমরা প্রাচীন ও নূতন প্রথার আরো কিছু সমালোচনা করিতে চাই।

প্রথমে প্রশ্ন এই, বাল্যবিবাহ আমাদের দেশে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল কি না? এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বড়ই কঠিন। মনু যে

আট প্রকার বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, সমাজে তখনও যৌবনবিবাহ প্রচলিত ছিল। কারণ আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহের তিনি যে লক্ষণ প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, স্ত্রীলোকের ও পুরুষের যৌবনকালে বিবাহ হইত। ব্রাহ্ম্য, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহে কন্যাদানের কথা আছে। (১) কিন্তু প্রথমোক্ত চারিপ্রকার বিবাহে কন্যাদানের কোন কথা নাই। (২) একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ব্রাহ্ম্য, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর ও গান্ধর্ব্ব, এই ছয় প্রকার বিবাহকেই মনু প্রশংসা করিয়াছেন, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহকে খুব নিন্দা করিয়াছেন; কিন্তু এ দুই প্রকার বিবাহকেও বিবাহ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ বিবাহকে বিবাহ বলিয়া সমাজ স্বীকার করিত কি না, সন্দেহ। কিন্তু মনু যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে এইগুলিকেও বিবাহ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (৩)। তৎপর দেখা যায়, মনু বলিতেছেন, "কন্যা অপ্রাপ্ত বয়স হইলেও, উৎকৃষ্ট অভিরূপ ও সদৃশ বর পাইলে, তাহাকে সেই বরে যথাবিধি দান করিবে।" (৪) "অপ্রাপ্তামপি"—"অপ্রাপ্ত বয়স হইলেও" এই কথায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বয়স হইলেই সাধারণতঃ বিবাহ হইত, তবে ভাল পাত্র পাইলে মনু তার অন্যথা করিতে বলিতেছেন। তারপর আরও স্পষ্ট করিয়া মনু বলিতেছেন,—

" কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

মনুসংহিতা, ৯ম অ, ৮৯ শ্লোক।

অর্থাৎ ঋতুমতী কন্যাও আমরণ পিতৃগৃহে অবস্থান করিবে, তথাপি ইচ্ছাপূর্ব্বক গুণহীন বরকে কখন কন্যা দান করিবে না।

---

(১) মনুসংহিতা তৃতীয় অধ্যায়—২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০ শ্লোক দেখ।

(২) মনুসংহিতা ঐ ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৪ শ্লোক।

(৩) "It may shock your sensibility to be told so, but forcible abduction was the usual form of marriage among your remote ancestors, and old Manu, while denouncing it as bestial, was obliged to admit when he wrote that it was a form of marriage and not rape." Dr. Rajendra Lal Mitter.

(৪) মনুসংহিতা নবম অধ্যায়,—৮৮ শ্লোক।

তারপর বলিতেছেন ;—

"ত্রিণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্‌॥"

মনুসংহিতা, ৯অ, ৯০ শ্লোক।

অর্থাৎ কুমারী ঋতুমতী হইলেও তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবে, এই কালের পরে ঊর্দ্ধ বা সদৃশ পতি গ্রহণ করিবে।

তারপর বলিতেছেন,—"যদি অদীয়মানা কন্যা স্বয়ং ভর্ত্তাকে যথাকালে বরণ করে, তবে সেই কন্যার ও বরের কোনও দোষ গ্রহণ করিতে হয় না।"—মনুসংহিতা, ৯ম অ, ৯১ শ্লোক। তারপর মনু বলিতেছেন—"স্বয়ম্বরা কন্যা পিতৃ মাতৃদত্ত অলঙ্কার গ্রহণ করিবে না।" ৯ম অ, ৯২ শ্লোক। ইত্যাদি।

এই সকল শ্লোকে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, মনু বালিকাদের যৌবনবিবাহের পোষকতা করিয়াছেন; তবে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, অপরিহার্য্য না হইলে এরূপ করা অবৈধ। পুরুষের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে মনু খুব স্পষ্ট আদেশ করিয়াছেন। গুরু-কুলে জীবনের অধিকাংশ কাল থাকিয়া বেদাধ্যয়ন ও ব্রতাচরণ সমাপ্ত না করিয়া বিবাহ করিবে না *। ২৪। ২৫ বৎসরের পূর্ব্বে তাহা হইত না। † পুরুষদিগকে গুরুকুলে থাকিতে তিনি আদেশ করিয়াছেন। কন্যাদিগকে বাল্যকালে পিতার বশে, যৌবনে পতির বশে থাকিতে আদেশ করিয়াছেন। ‡ ইহাতে বুঝা যায়, মনু স্ত্রী-স্বাধীনতার খুব বিরোধী ছিলেন। সে যাহা হউক, একটি শ্লোকে তিনি বিবাহের বয়সে একটু গোল করিয়াছেন। ৯ম অধ্যায়ের ৯৪ শ্লোকে দেখা যায় ;—

"ত্রিংশদ্বর্ষে বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাংদ্বাদশবার্ষিকীম্‌"

অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি, দ্বাদশবর্ষীয় কন্যাকে বিবাহ করিবে, ইত্যাদি।

উপরোক্ত শ্লোক সকলের পর এই শ্লোকটী থাকায় আমাদের মনে হয় যে, তিনি এতদ্বারা অনুপাত ঠিক করিতেছেন; কিন্তু ইহাতে ইহাও বুঝা যায় যে, সে সময়ে এইরূপ বিবাহ হইত। যাহা হউক, বিকৃত অর্থ করিলেও, এ শ্লোকে বালিকাদের পক্ষে বাল্যবিবাহের বিধি থাকিলেও, পুরুষদিগের

---

* মনুসংহিতা—৪র্থ অ—১ম, ৩য় অ ২, ২য় অ সমস্ত ও ৩য় অ ৪ শ্লোক।

† হিন্দুবিবাহ সমালোচন—প্রথম খণ্ড ১৩।১৪ পৃষ্ঠা।

‡ মনু—৫ম অ, ১৪৭ ও ১৪৮ শ্লোক।

পক্ষে নাই। হিন্দুসমাজে বর্ত্তমান সময়ে পুরুষদিগের যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে, তাহা দেশাচার মাত্র; তাহা শাস্ত্রের অনুমোদিত মোটেই নয়। পূর্ব্বে আমাদের দেশে বালিকাদের যে অধিক বয়সে বিবাহ হইত, স্বয়ম্বর প্রথাই তাহার প্রমাণ, এবং সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, সুভদ্রা, রুক্মিণী, গান্ধারী, দেবযানী, প্রভৃতির বিবাহেই তাহার আরো স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।* বৈদিক, স্মার্ত্তিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক কালে বালিকার পক্ষেও বাল্যবিবাহ যে প্রচলিত ছিল না, "সুরভি ও পতাকায়" শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র মহাশয় তাহা সুন্দররূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। † তবে তিনি বলিতেছেন যে, "কেবল দানসাধ্য বিবাহে (যাহা পরবর্ত্তী স্মার্ত্তিককালে কেবল ব্রাহ্মণগণেই আবদ্ধ ছিল) অনেক স্থলে বালিকার পরিণয় হইত, কিন্তু তাহা বালকের সহিত কদাচ সংঘটিত হইতনা।" সুরভি ও পতাকা—৮ই পৌষ—১২৯৪। শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র মহাশয়, ইতিপূর্ব্বে "হিন্দুবিবাহ-সমালোচনা" নামক পুস্তকেও প্রমাণ করিয়াছেন যে, "বাল্যবিবাহ বিস্তৃত-রূপে প্রচলিত ছিল না, তবে কোন কোন স্থানে একটু আধটু ব্যবস্থা দেখা যায় মাত্র। কথায় বলে, নানা মুনির নানা মত, সকলে যে একমত হইবেন, ইহা কখনও আশা করা যায় না।"

এখন প্রশ্ন এই, হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক যোগ বা মুক্তি কি না? শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "হিন্দুপত্নী", "বিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য", ও "হিন্দুবিবাহ" নামক প্রবন্ধত্রয়ে মীমাংসা করিয়াছেন যে, হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক।‡ বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয়গণ এই কথাটী খণ্ডন করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে, হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক নয়।§ ইঁহাদের উভয়ের প্রবন্ধ অন্যান্য বিষয়ে খুব সারগর্ভ হইলেও এবিষয়ে ভ্রমাত্মক বলিয়া আমাদের মনে হয়। মনু বলিয়াছেন, গৃহস্থাশ্রম সকল

---

* হিন্দুবিবাহ সমালোচনা, প্রথম খণ্ড ৯ম পৃষ্ঠা; and Hygiene and Public Health in Bengal by D. Basu, vol II. P 130.

† সুরভি ও পতাকা—বাল্যবিবাহ ১ম হইতে ৮ম প্রস্তাব, কার্ত্তিক হইতে ১৫ই পৌষ, ১২৯৪।

‡ সাবিত্রী, ৫৯ পৃষ্ঠা হইতে ৯১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

§ ভারতী, ১১শ ভাগ পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ, এবং বিভা, ১ম ভাগ, ৫ম সংখ্যা অমৃত বাবুর প্রবন্ধ দেখ।

আশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। * তার পর তিনি বলিতেছেন, "যিনি অক্ষয় স্বর্গ ও ঐহিক সুখ ইচ্ছা করেন, তিনি প্রযত্ন সহকারে গৃহস্থাশ্রম সতত অবলম্বন করিবেন। দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ব্যক্তি এ আশ্রম অবলম্বন করিতে সমর্থ নহে।"† বিবাহ ভিন্ন গৃহস্থাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় না, সুতরাং স্বর্গ লাভের জন্য বা মুক্তির জন্য বিবাহ যে হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ, ইহাতে সন্দেহ কি? হর পার্ব্বতীর বিবাহ, রামসীতার বিবাহ প্রভৃতি যে সম্পূর্ণ ধর্ম্মভাবের জীবন্ত দৃষ্টান্ত ঘোষণা করিতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। চন্দ্রনাথ বাবু রবীন্দ্র বাবুর উত্তরে অনেক যুক্তি সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক ভিন্ন আর কিছুই নয়।‡ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যই প্রধান, গৌণ উদ্দেশ্য পুত্র লাভ ইত্যাদি। চন্দ্রনাথ বাবু খুব যোগ্যতা সহকারে রবীন্দ্র বাবুর কথা সকল কাটিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু অমৃত বাবু ১২৯৪ সালের মাঘ মাসের বিভাতে বলেন যে, "যে কালে চারি আশ্রমের নিয়ম ছিল, সেই কালে যদি বিবাহ আধ্যাত্মিক হইয়া থাকে, তবে যখন সেই আশ্রম চতুষ্টয় লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন আর বিবাহ আধ্যাত্মিক হইতে পারে না।" কথাটা ঠিক, কিন্তু লেখক জানেন না যে, পাশ্চাত্য বিবাহ-প্রথা আরো কত কলুষিত! আমাদের একজন বিলাত প্রত্যাগত বন্ধু বিলাতের বিবাহকে "Angling" বড়শীদ্বারা মাছ ধরার ন্যায় বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। সোজা কথাতে, আমরা ইহাই বুঝি, প্রাচীন আর্য্য সমাজের সকল বিধি, সকল অনুষ্ঠানের লক্ষ্যই ধর্ম্ম বা মুক্তি। ধর্ম্ম ভিন্ন কোন কথা নাই। হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য যে আধ্যাত্মিক ছিল, যৌবন বিবাহ প্রতিষ্ঠিত থাকাই তাহার প্রমাণ। পুরুষ, ধর্ম্ম শিক্ষা শেষ না করিয়া বিবাহ করিবে না, ইহাই তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ। কিন্তু সে সকল প্রাচীন কাহিনী এখন স্বপ্নের ন্যায় হইয়াছে।

হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য অধ্যাত্ম যোগ বা মুক্তি হইলে বালিকার চরিত্র লাভ ও ধর্ম্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে যে বিবাহের ব্যবস্থা, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই বোধ হয়, প্রাচীনকালে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল না।§ আমাদের বিবেচনায় এ বিষয়ে বিজ্ঞানের সাহায্যও চাই।

---

* মনুসংহিতা, ৩য় অধ্যায় ৭৭ ও ৭৮ শ্লোক।

† মনুসংহিতা ৩য় অধ্যায় ৭৯ শ্লোক।

‡ নবজীবন ৪০ সংখ্যা, কার্ত্তিক, হিন্দুবিবাহ।

§ সুরভি ও পতাকা, পৌষ ১২৬ পৃষ্ঠা।

ধর্ম্ম ও প্রেম-ব্রত শিক্ষার পর সুশ্রুতসংহিতা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আদেশ পালন করাই সর্ব্বতোভাবে উচিত। এখন যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে, তাহা দেশাচার মাত্র। এই দেশাচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? যেরূপ দেখা যাইতেছে, কন্যাভারগ্রস্ত হওয়া প্রযুক্তই হউক, (অর্থাৎ কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে হইলে এখন অনেক টাকা লাগে, সকলের উপযুক্ত টাকা না থাকার দরুণই হউক) বা পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণেই হউক, অনেক স্থলে খুব বয়স্থা বালিকা দেখা যায়। এই জন্যই রক্ষণশীল দলের অগ্রণী শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু বালিকার বয়স ১৩ বৎসর করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন(১), এবং বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার কন্যাদের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়াছেন (২)। শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র এবং শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কন্যার অন্যূন ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ বৎসরের সময় এবং পাত্রের সপ্তদশ অষ্টাদশ বৎসর বয়সে বিবাহ দিতে বলেন(৩)। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুসমাজের উপর দিয়া যে প্রবল পরিবর্ত্তনস্রোত চলিয়াছে, তাহাতে বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাইতেছে এবং কালে আরও যাইবে; কাহারও সাধ্য নাই তাহার গতি রোধ করে(৪)। তবে হিন্দুসমাজে বয়সের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকিবে কি না, সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজের মতে বালিকার ১৪ বৎসর বিবাহের ন্যূন বয়স, হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলদলের মতে ১৩ বৎসর ঊর্দ্ধ বয়স। আর এক বৎসর উঠিলে নিম্নে ও ঊর্দ্ধে মিলন হইতে পারে। আমাদের বিবেচনায়, আদর্শ আরো উপরে তুলিয়া দেওয়া উচিত। এত অল্প বয়সে বালিকাদের ধর্ম্ম ও চরিত্র-লাভ বা সুশিক্ষা, এ সকল কিছুরই অঙ্কুর জন্মে না। যে হিসাবে ১৩ বৎসর পর্য্যন্ত বালিকা রাখা যাইতে পারে, সেই হিসাবে আরো কিছু কাল রাখিলে ক্ষতি নাই। চন্দ্রনাথ বাবু প্রভৃতি একান্নবর্ত্তী পরিবারের জন্য বালিকা বিবাহের পোষকতা করেন। সে সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আর একটী কথা বলা নিতান্ত উচিত। পাশ্চাত্য সমাজসমূহে একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেখানে শাশুড়ী পুত্রবধূ কখনও

---

(১) নবজীবন কার্ত্তিক ১২৯৪, ২২৪ পৃষ্ঠা।

(২) Speeches of Eminent Indian Gentlemen. Page 52.

(৩) স্ত্রীজাতি ও বিবাহ নামক পুস্তকের ৯৮ পৃষ্ঠা দেখ। এবং হিন্দুবিবাহ সমালোচন দ্বিতীয় ভাগ ১৭০ পৃষ্ঠা।

(৪) See the Speeches of Eminent Indian Gentlemen on Hindu marriage customs. p. 86-87.

একত্রে থাকে না। যুবতীর বিবাহ প্রচলিত হইলে আমাদের দেশেও সেইরূপ হওয়ার আশঙ্কা আছে। কিন্তু বাঙ্গালার কুলীন কন্যাদের অধিক বয়সে বিবাহ হয়, তাহারা ত স্বামীর পরিবারকে আপন জ্ঞান করে; বিশেষতঃ প্রাচীন কালেও একান্নবর্ত্তী পরিবার ছিল। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায়, শিক্ষার ত্রুটীতেই পাশ্চাত্য সমাজে ঐরূপ কুফল ফলিয়াছে। ১৩ বৎসরের পর আর কিছুদিন রাখিলেই বালিকারা খারাপ হইবে, এরূপ সন্দেহ করা নিতান্ত অন্যায়। আমাদের দেশের গৃহলক্ষ্মীদিগের চরিত্রের মূল্য এত অল্প মনে করা উচিত নয় (৫)। পুরুষদিগের এত অল্প বয়সে বিবাহ না হইলেও, অধিকাংশই, বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, অর্থাৎ স্কুলে থাকা পর্য্যন্ত, ভাল থাকে। তবে যেখানে সমাজের বা অভিভাবকের অবস্থায় কন্যা রাখা কষ্টকর, সে স্থলে স্বতন্ত্র কথা। যাহা হউক, বয়স সম্বন্ধে প্রাচীন প্রথা ও নব্য প্রথার মধ্যে অতি অল্পই পার্থক্য দেখা যায়। ব্রাহ্মসমাজ এ সম্বন্ধে দেশের প্রাচীন মতানুসারে যে কতক কার্য্য করিতে পারিয়াছেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে এই বিবাহ প্রথাকে সংস্কৃত করিয়া ব্রাহ্মসমাজ যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন (৬), এক সময়ে সে জন্য ব্রাহ্মসমাজ এদেশে পূজা পাইবেন। কিন্তু কথা এই, বয়স সম্বন্ধে যেরূপ অগ্রসর হইয়াছেন, ধর্ম্ম, নীতি ও শিক্ষা সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ সেরূপ অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে—ব্রাহ্মিকাদের মন দিন দিন বিলাসের দিকে ঝুঁকিতেছে। এই প্রবল স্রোত ফিরাইতে চেষ্টা করা খুব উচিত। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। বিলাসের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, সুশিক্ষা ও সুনীতিতে ভূষিত করিয়া, উপযুক্ত কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজকে এখনও কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে।

অভিভাবকের উপর বা গুরুর উপর কন্যা এবং পাত্রের সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ। তাঁহারাই পাত্র পাত্রী মনোনীত করেন। প্রাচীন কালে দুই এক স্থলে অন্যরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকিলেও—

(৫) Hygiene and Public Health in Bengal by Surgeon D. Basu, Vol II P. 147.

(৬) Leonard's History of the Brahmo Samaj. Page 164.

অধিকাংশ স্থলে পাত্র পাত্রী মনোনয়নের ভার অভিভাবকদিগের উপর থাকিত। যে চারিপ্রকার বিবাহে কন্যাদানের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে ত সম্পূর্ণ অভিভাবকদিগের কর্তৃত্ব। স্ত্রীস্বাধীনতার তত বিস্তার বা আদর ছিল না। ব্রাহ্মসমাজেও যে খুব বিস্তার হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। তবে কোন কোন স্থানে হিন্দুসমাজেও স্ত্রীস্বাধীনতা আছে, কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মসমাজেও আছে। ব্রাহ্মসমাজে মনোনয়ন-প্রথার একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছে, ইহাতে আমাদের খুব আপত্তি। কেশব বাবুরও খুব আপত্তি ছিল।* সে সকল কথা পূর্ব্বে যথাযথ আলোচনা করিয়াছি। অভিভাবকের মতামতের উপর নির্ভর না করিলে বিবাহ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে না। চরিত্র, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, বংশপরম্পরার চরিত্র ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি, নানা বিষয়ের অনুসন্ধান প্রয়োজন। কেবল পাত্র পাত্রীর উপর ভার দিলে তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এই জন্য, আমরা ব্রাহ্মসমাজকে, হিন্দুরিত্যনুসারে, কেবল বর কন্যার উপর মনোনয়নের ভার না রাখিয়া অভিভাবকের উপর অধিক দিতে বলি। ইহাতে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবে না। পিতা মাতা, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে চটাইয়া নিজের সুখের জন্য স্বেচ্ছা-বিবাহ করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। নিজের সুখই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য নয়। আত্মসংযম ব্রত গ্রহণ করিয়া অন্যের সুখ, অন্যের সুবিধা দেখা খুব উচিত। ব্রাহ্মসমাজে কেহ কেহ আত্মীয়ের মত-বিরুদ্ধ বিবাহ করিয়াছেন; আর কেহ কেহ এমনও আছেন যে, পিতা মাতার মত-বিরুদ্ধ বিবাহ করিতে হয় বলিয়া বিবাহ করিতেছেন না। তাঁহা-দিগের কি মহত্ত্ব! বাস্তবিকও এইরূপ হওয়াই উচিত। নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বা স্বার্থ—অন্যের জন্য পরিত্যাগ করাতেই মহত্ত্ব। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি; আর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। এ সম্বন্ধে প্রাচীন মত গ্রহণ করা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একান্ত উচিত।

---

* See Life and Teachings of Keshub Chunder Sen, P. 266.

নবম পরিচ্ছেদ।

অসবর্ণ ও আন্তর্জাতিক বিবাহ।

সমাজে চিরকাল প্রধানতঃ দুইরূপ বিবাহ প্রচলিত। একরূপ আধ্যাত্মিক ও আর একরূপ পৈশাচিক। আধ্যাত্মিক বিবাহ সম্বন্ধে আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছি, পৈশাচিক বিবাহ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা উচিত। যে বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্ম্মলাভ নয়, কেবল সুখলাভ, সে বিবাহও সংসার-বিজ্ঞানের দিক ষোল আনা দেখিয়া নির্ব্বাহ করা উচিত। বর্ত্তমান জন সংখ্যা বৃদ্ধিই যে দারিদ্র্যের একটী কারণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মালথাস প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রতি ২৫ বৎসরে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্বিগুণিত হইতেছে। ক্রমাগত এইরূপ বৃদ্ধি হইলে জগতের বাসস্থানেও সঙ্কুলান হইবে না। এজন্য পৃথিবীর অনেক লোক খুব চিন্তিত হইয়াছেন। অসদুপায়ে জন সংখ্যা হ্রাস করার আমরা তত পক্ষপাতী নই, কিন্তু দেশের দারিদ্র্য নিবারিত হয়, আমরা সর্ব্বতোভাবে কামনা করি (১)। এজন্য পুরুষের অনুকূল অবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বে বিবাহ করা কোন ক্রমে যুক্তিযুক্ত নয়। যতদিন পর্য্যন্ত বর নিজের পরিবারের ভরণপোষণ যোগাইতে না পারে, ততদিন বিবাহ করা উচিত নয়। কাহারও কাহারও মত দেখা যায়, বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই খাইতে দিবেন। তিনি খাইতে দেন সত্য, কিন্তু কতকগুলি নিয়মের অধীন করিয়া খাইতে দেন। চাষ করা, বীজ বপন করা, গৃহ নির্ম্মাণ করা, মিতব্যয়ী হওয়া, এ সকলও তাঁহারই নিয়ম। ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞাননীতি—সকলের মধ্যেই বিধাতার ইঙ্গিত রহিয়াছে। সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হওয়াই উচিত (২)। কিন্তু এ সম্বন্ধে

---

(১) "It is an utter misconception of my argument to infer that I am an enemy to population. I am only an enemy to vice and misery and consequently to that unfavourable proportion between population and food which produces these evils." Malthus on population P. 484.

(২) "We find that what seem at first sight like divergences and exceptions, are but manifestations of the same principles. And we find that everywhere we can trace it, the social law runs into and conforms with the moral law; that in the life of a community, justice infallibly

আমাদের দেশের লোকেরা নিতান্ত উদাসীন। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা এ বিষয়ে খুব সতর্ক হইয়াছেন, কিন্তু তবুও আশানুরূপ ফল ফলে নাই। অনেককেই দারিদ্র্য কষ্টে দিনাতিপাত করিতে হইতেছে। অন্যান্য বিষয় পরীক্ষা করিবার সময় এ বিষয়টীও একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

দারিদ্র্য নিবারণের জন্য তিব্বতে এক পরিবারের ৫।৭ ভ্রাতা মিলিয়া এক পাত্রীকে বিবাহ করে। ইহাতে পরিবারে ঝগড়া বিবাদ হয় না, এবং সন্তানের সংখ্যা অধিক হয় না (৩)। এ প্রথা আমাদের দেশেও যে এক সময়ে না ছিল, তাহা নয়। আমরা জানি ছিল। আমাদের দেশে এক দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী ছিল। যাহা হউক, এ সকল বিষয়ের অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। এক স্বামীর বহু স্ত্রীও যেরূপ দূষিত, এক স্ত্রীর বহু স্বামীও সেইরূপ দূষিত। আমাদের দেশে কৌলিন্য প্রথায় যে কি অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, যাহারা বহু বিবাহের বিরোধী, তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ এক স্ত্রীর বহু স্বামীর পোষকতা করিয়াছেন। বহু বিবাহ সুসভ্য সমাজে কখনই আদৃত হইবে না। এক সময়ে একাধিক স্বামী বা স্ত্রী গ্রহণ সর্ব্বত্রই দূষিত হইবে। আমরা বলি, একাধিক স্বামী বা স্ত্রী গ্রহণ কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়। এক স্বামীর বহু স্ত্রী হইলে জন সংখ্যা খুব বৃদ্ধি হয়; এবং এক স্ত্রীর বহু স্বামী হইলে জন সংখ্যা হ্রাস হয় বটে, (কেননা, এক স্ত্রী এক সময়ে অধিক সন্তান ধারণ করিতে পারে না) কিন্তু চতুর্দ্দিক দিয়া দেখিলে এটাকে পৈশাচিক বিবাহ বলিয়া বোধ হয়। এরূপ বিবাহ আমাদের দেশে আদৃত নয়; সুতরাং ইহার আর আলোচনার প্রয়োজন নাই।

আর একটী কথা। আমাদের দেশে নির্দ্দিষ্ট ঘরে বিবাহের নিয়ম থাকায়, এক দিকে হিন্দুসমাজে বরের পণ বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্য দিকে কুলীন ঘরে অনেক মেয়ে আজীবন কুমারী থাকিয়া যাইতেছেন। কাহারও একাধিক স্ত্রী,

---

brings its reward and injustice its punishment." See—Progress and Poverty by Henry George, P. 397.

"Every express command given to man by his Creator is given in subordination to those great and uniform laws of nature which he had previously established, and we are forbidden both by reason and religion to expect that these laws will be changed in order to enable us to execute more readily any particular precept." Malthus on population.

(৩) স্ত্রীজাতি ও বিবাহ—৮২ পৃষ্ঠা দেখ।

কাহারও মোটেই স্ত্রী নাই, বঙ্গপ্রদেশের ব্রাহ্মণের ঘরে অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায়। কুলীন ব্রাহ্মণের অনেক স্ত্রী প্রায় পিত্রালয়ে থাকে, স্বামীর ঘর অতি অল্পকেই করিতে হয়। এজন্য কুলীন কুমারী, কুলীন পত্নী এবং ভঙ্গ ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকের চরিত্র দূষিত হইতে দেখা যায়। এই সকল অনিষ্ট নিবারণের জন্য মেল ভাঙ্গিয়া বিবাহ দেওয়া নিতান্ত উচিত। বিক্রমপুরের বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মেল ভাঙ্গিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া এদেশের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট ঘর ভিন্ন বিবাহ দিতে পারিবে না, এই নিয়ম যত দিন থাকিবে, তত দিন এ দেশের মঙ্গল নাই। এ স্থলে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সগোত্রে বিবাহ হইলেও রক্ত-সামীপ্য বশতঃ নানা প্রকার অমঙ্গল ঘটে। তাহা প্রচলন করাও উচিত নয়। তবে উচিত কি? ক্রমে বলিতেছি।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে অসবর্ণ বিবাহ ও আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রচলিত না থাকার দরুণই উল্লিখিত নানারূপ দুর্ঘটনার বৃদ্ধি হইয়াছে। আমাদের দেশে এ নিয়ম কোথা হইতে আসিল, বলা যায় না। পূর্ব্বে যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল না, এমন নয়। দেখুন, মনু কি বলিতেছেন ;—

"শ্রদ্দধানঃ শুভং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।" মনু, ২য় অ, ২৩৮।

"শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, শূদ্র হইতেও শুভ বিদ্যা গ্রহণ করিবে, চণ্ডাল হইতেও পরমধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। এবং নিকৃষ্ট কুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করিবে।"

"স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মঃ শৌচং শুভাষিতম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ॥ মনু, ২য় অ, ২৪০।

"স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, হিতবাক্য এবং নানাপ্রকার শিল্পকার্য্য, এই সমস্ত সকলের নিকট হইতেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।" বর্ণ চতুষ্টয় হইতে ভারতে অসংখ্য বর্ণশঙ্কর জাতির উৎপত্তিই ইহার চূড়ান্ত প্রমাণ।

কুল ভাঙ্গিয়া বিবাহ না দিলে এ দেশের কুলীন বংশের মঙ্গল নাই, বিবাহের পণ হ্রাস হওয়ারও উপায় নাই। অসবর্ণ বিবাহ ব্রাহ্মসমাজ প্রচলন করিতেছেন, কিন্তু আন্তর্জাতিক বিবাহ তত প্রচলিত হয় নাই। আমাদের দেশীয় লোকের দৈহিক ও মানসিক অবনতি দূর করিতে হইলে, এদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় লোকের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কেবল স্বাস্থ্যের জন্যও নয়, জাতীয় একতা বর্দ্ধনের জন্য, নৈতিক জীবন বিনিময়ের

জন্য এবং বিভিন্ন প্রদেশবাসীদিগের সুখদুঃখে সমজ্ঞান বৃদ্ধির জন্যও ইহা করা নিতান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমান সময়ে বড় বড় লোকদিগের মধ্যে অনেকে আপত্তি করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত নাই, কিরূপে এদেশবাসীরা একজাতি হইবে? প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, এক ভাষা, এক ধর্ম্ম যেমন একজাতিত্ব গঠনের জন্য প্রয়োজন, আচার ব্যবহার, বৈবাহিক কার্য্যাদি পরস্পরের মধ্যে নির্ব্বাহিত হওয়াও সেইরূপ প্রয়োজন। ভারতবর্ষে ইংরাজি শিক্ষার অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে একচুলও ভারতবর্ষ অগ্রসর হয় নাই। এজন্য কত ব্যক্তি আমাদিগকে বিদ্রূপ করিতেছেন, নিন্দা করিতেছেন, দেখ (১)। বোধ করি এ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই যে, রক্ত-মিশ্রণের ন্যায় আত্মীয়তা বৃদ্ধির আর দ্বিতীয় উপায় নাই। এক অবস্থাপন্ন, একভাবাপন্ন, সম-স্বার্থপূর্ণ না হইলে জাতিত্ব গঠন হয় না। ভারতবর্ষে আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রচলিত না হওয়া পর্য্যন্ত এদেশে এক জাতিত্বের উদ্ভব সম্ভব নয়। সকল হিতৈষীর এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া একান্ত উচিত।

ব্রাহ্মসমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটু অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে আমাদের দেশের ন্যায় জাতিভেদ প্রথা নাই সত্য, কিন্তু ক্রমে ক্রমে এক অভিনব জাতিভেদের ভাব ক্রমে এই সমাজ মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতেছে। বিদ্বান মূর্খ, ধনী দরিদ্র, উচ্চপদাভিষিক্ত নিম্নপদপ্রাপ্ত, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক—এরূপ ভেদাভেদ ব্রাহ্মসমাজে সৃষ্টি হইয়াছে। আহারে বিহারে পর্য্যন্ত জাত্যাভিমানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সমাজমন্দিরের নির্দ্দিষ্ট আসনেও একথার প্রমাণ পাওয়া

---

(১) "But below this veneer of imported civilisation what signs can we discern of the weightier social changes which Western teaching might have been expected to induce? The elaborate scheme of prohibitions on intermarriage which is called the caste system, appears to be as strong now as it was when Lord Macaulay was in India." * * *

"But this contemplative habit of mind which prefers ideas to realities, theory to practise, book-learning to the observation of facts, whatever may be its weakness in the domain of action, becomes a source of strength directly we enter the cloud-land of religion.' The Vice-chancellor's address.

Englishman, 19th January, 1889.

যায়; ব্যক্তি বিশেষের উপস্থিতির জন্য নিমন্ত্রণ-সভা হইতে ধার্ম্মিক লোকদিগের গাত্রোত্থানেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। বড় লোকেরা ছোট লোকদিগের সহিত মিশিতে কুণ্ঠিত! ধার্ম্মিক ব্যক্তি অধার্ম্মিকের সহিত একত্রে আহার বিহার করিতে নারাজ!! এইরূপেই পূর্ব্বে এদেশে জাতিভেদের অঙ্কুর উপ্ত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, সর্ব্বাপেক্ষা এই জাতিভেদের পরিচয় পাওয়া যায়, বিবাহে। ব্রাহ্মণ বংশীয় লোকেরা এখন ব্রাহ্মণ বংশেই পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে চান;—কায়স্থ ও বৈদ্যদের মধ্যেও এইরূপ ব্যবহার দেখা যায়। ইহাপেক্ষা আরো শোচনীয় কথা আছে। যে সকল মেয়েরা একটু ভাল লেখাপড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারা বিলাত-ফেরত লোক ভিন্ন বিবাহ করিতে তত প্রস্তুত নন্। কিন্তু এস্থলে ব্যক্ত করা উচিত যে, একজন উচ্চ শিক্ষা-প্রাপ্ত মহিলা একজন অপেক্ষাকৃত অল্প-শিক্ষিত ও নিম্নপদাভিষিক্ত ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া এ সম্বন্ধে যে সৎদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দ্বারা এদেশের মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তনের জন্য, আপন কন্যাকে কোচ জাতিতে বিবাহ দিয়া, মহাত্মা কেশবচন্দ্র যে সৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, সেরূপ এদেশে আর ঘটে নাই। এরূপ মহৎ কার্য্যকেও লোকেরা স্বার্থ-প্রণোদিত কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করে! আমরা জিজ্ঞাসা করি, এদেশের কয়জন লোক, এ পর্য্যন্ত নীচ জাতিতে কন্যার বিবাহ দিতে পারিয়াছেন? পঞ্জাবের সর্দ্দার দয়াল সিংহ একজন ধনী লোক। তিনি ব্রাহ্মসমাজে বিবাহ কবিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা যতদূর জানি, কেহই তাঁহার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেন নাই;—দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া অবশেষে তিনি দেশেই বিবাহ করিয়াছেন। চেরাপুঞ্জির রাজার এক সহোদর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। শুনিয়াছি, তাঁহার মেয়েদিগকে বাঙ্গালীর সহিত বিবাহ দিতে তিনি প্রস্তুত, কিন্তু পাত্র মিলে না। শ্রীহট্ট-নিবাসী কোন ভদ্রলোক খাসিয়া রমণী বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার ঔরসজাত কন্যাদিগকে বাঙ্গালীর সহিত বিবাহ দিতে তিনি ইচ্ছুক, কিন্তু পাত্র মিলে না। এইরূপ দৃষ্টান্ত যে আরো কত দেওয়া যায়, সংখ্যা নাই। এ সম্বন্ধে ব্রাহ্ম-সমাজ দিন দিন আরো সঙ্কীর্ণ হইতেছেন। খাসিয়া জাতির ন্যায় সুশ্রী এবং বলিষ্ঠ জাতির সহিত বাঙ্গালীর রক্ত-মিশ্রণ হইলে যে কি সুন্দর হয়, বলা যায় না। সেই রূপ লেপচা, নেপালী, ভুটিয়া, পাঞ্জাবী, বেহারীদিগের সহিত আদান চলিলে কেমন সুন্দর হয়! দুই একটী বাঙ্গালীর রক্ষিতা পাহাড়ীয়া

রমণীর গর্ভজাত সন্তান সন্ততি আমরা দেখিয়াছি, তাহাদিগকে দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। হায়, কবে এদেশে আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রচলিত হইবে,—কবে এদেশের সমগ্র নরনারী মিলিয়া এক জাতিতে পরিণত হইবে,—কবে মহামিলন সংঘটিত হইবে!! নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দিষ্ট ঘরে বিবাহ হওয়ায় এ দেশের নরনারী দিন দিন নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িতেছে। তাহার উপর জল বায়ু ও ম্যালেরিয়া আরো সর্ব্বনাশ করিতেছে। হায়, কবে দেশের চৈতন্য হইবে!

ব্রাহ্মসমাজ দিন দিন এ সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ হইতেছেন দেখিয়া আমরা বড় ভীত হইতেছি। আন্তর্জাতিক বিবাহ ভিন্ন এই পতিত জাতির উদ্ধারের আর পন্থা নাই। কিন্তু সে দিকে কে দৃষ্টিপাত করিবে? জাতিভেদ না মানিয়াও ব্রাহ্মসমাজ দিন দিন এক অভিনব জাতিভেদের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। নীচ বংশ, উচ্চ বংশ, বড় ঘর, ছোট ঘর, এ জাতি, সে জাতি;—এদেশ সে দেশ,—এ ভেদাভেদ-বোধ অন্তর হইতে দূর না হইলে কেমনে বল, মানুষ মিলনের রাজ্যে যাইবে? কেবল কথার মিলনে কাজ হইবে না;—সময় থাকিতে এখন কাজের মিলন—রক্ত-মিশ্রণ-কার্য্য সংসাধন কর, নচেৎ এজাতি অবনতির অতল জলে ডুবিল, আর রক্ষা নাই। জাতিভেদ ভাঙ্গিতে যিনি চান, তাঁহার উচিত, আন্তর্জাতিক বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের জন্য প্রাণপণে যত্ন করেন; নচেৎ আবার জাতিভেদ-প্রথা জাগিয়া সকল সংস্কার-কার্য্যকে পণ্ড করিয়া ফেলিবে। অতএব সাবধান, সাবধান।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিবাহের বয়স, বহুবিবাহ ও অসমবিবাহ।

বিবাহ সম্বন্ধে মোটামুটী যে সকল কথা বলা প্রয়োজন, আমরা এক প্রকার তাহা বলিয়াছি। কিন্তু বিবাহের বয়স সম্বন্ধে আরও কিছু বলা উচিত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং আমাদিগের দেশের সুশ্রুত-সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র একরূপ স্থিররূপে নির্ণয় করিয়াছেন যে, রজঃস্বলা হইবার পূর্ব্বে বালিকার বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। রক্ষণশীল দলের অন্যতর চিন্তাশীল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বালিকার বিবাহের বয়স ১০ হইতে ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। * যে কার-

* নবজীবন—কার্ত্তিক, ১২৯৪।

শেই হউক, তাঁহার পূর্ব্বের মত কতক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি এক স্থানে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, "বিজ্ঞান যে সর্ব্বত্র ঠিক নয়, ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাইতেছি; তবে কেমন করিয়া বিজ্ঞানের কথা মানিব?" অথচ তিনি বালিকার বিবাহের বয়স, হিন্দু সমাজের প্রচলিত নিয়ম উপেক্ষা করিয়া, দশ বৎসরের উপর তুলিয়াছেন এবং স্থানান্তরে বলিতেছেন,—"শারীর বিজ্ঞান স্ত্রী-গমন সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রমাণ করিয়া দিবে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপায়েই তাহা পালন করা সম্ভব ও কর্ত্তব্য। শারীর বিজ্ঞান মানিতেই হইবে। কিন্তু শারীর বিজ্ঞানকে সমাজ-নীতি ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের অধীন না করিলে শরীর বিজ্ঞান একেবারে নিরর্থক হইবে।" ইহাতেই বোধ হয় যে, বিজ্ঞান সর্ব্বত্র ঠিক না হইলেও, একেবারে যে অঠিক, তাহা তিনিও মনে করেন না। সে যাহা হউক, আমাদের বিবেচনায়, বয়স সম্বন্ধে সর্ব্বত্র একটা স্থির নির্দ্দিষ্ট নিয়ম রাখা সম্ভব নয়। ধর্ম্মজ্ঞান-উন্মেষ, চরিত্র-গঠন, অবস্থার উন্নতি এবং স্বাস্থ্যোন্নতি—এ সকলের উপরই বিবাহ সম্বন্ধে অধিক পরিমাণে নির্ভর করা উচিত। দেশ, কাল, অবস্থা, এ সকলকেও লক্ষ্য করিতে হইবে। ধর্ম্ম-জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে কোন-ক্রমেই পাত্রপাত্রীর বিবাহ দেওয়া সঙ্গত নয়। সেটা বালিকার পুতুলের বিয়ে দেওয়ার ন্যায়। ধর্ম্মজ্ঞান উন্মেষের জন্য সমাজকে বিশেষরূপ প্রস্তুত হইতে হইবে। না হইলে, পদে পদে অমঙ্গল ঘটিবে। এ সকল কথা আমরা বিস্তৃত-রূপে আলোচনা করিয়াছি। ধর্ম্মজ্ঞান কাহার কোন্ সময়ে হইবে, স্থির করিয়া বলিতে পারা যায় না। তবে দর্শন, বিজ্ঞান ও মনুষ্যের অভিজ্ঞতা যতদূর আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, তাহাতে ইহা স্থিররূপে বলা যাইতে পারে, পুরুষের ২০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে সাধারণত ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে না। বালিকাদের সম্বন্ধেও এই নিয়ম। কিন্তু স্ত্রীর বয়স অপেক্ষা স্বামীর বয়স ৮।১০ বৎসর অধিক হওয়া যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ ২৩।২৪ বৎসরের যুবক ১৫।১৬ বৎসরের যুবতীকে বিবাহ করিলে ভাল হইবার সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত স্ত্রী ও স্বামীর বয়সের মধ্যে ২৫ বৎসরের অধিক প্রভেদ হইলে তদুৎপন্ন-সন্তানগণ হীনবল, রুগ্ন ও অল্পায়ু হয় (১)। তবে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা-

(১) See—Hygiene and Public Health in Bengal By Surgeon Dr. D Basu, Vol II P. 152; Acton P. 157. এবং হিন্দুবিবাহ সমালোচন—প্রথম খণ্ড ১০৮ পৃষ্ঠা।

নুসারে স্থানে স্থানে নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে হয়। সকল অভিভাবকের বয়স্থা বালিকাকে গৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিবার তত সুবিধা নাই বলিয়া, স্থান বিশেষে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটা অপরিহার্য্য। বয়স্থা বালিকা রাখার একেবারে যে সুবিধা নাই, সে কথাও কিন্তু বলা যায় না। আমাদের দেশে কুলীন ব্রাহ্মণ-ঘরে অনেক অধিক বয়স্কা যুবতী বালিকা থাকে। সে যাহা হউক, ধর্ম্ম জ্ঞান ও চরিত্রলাভ অতি আবশ্যকীয়। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যে কার্য্য দ্বারা চরিত্রে দুর্নীতি ও অধর্ম্ম স্থান পাইবার সম্ভাবনা, তাহাতে কাজেই নিয়মের অন্যথা করিতে হইবে। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে বালিকার বিবাহ দেওয়াও বাঞ্ছনীয়, যদি ধর্ম্ম ও চরিত্র রক্ষার আর উপায় না থাকে। বয়স অধিক হইলেই যে সর্ব্বত্র ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে, তাহা নয়। বয়সের সঙ্গে সেরূপ শিক্ষা না দিলে সুফল ফলে না। যেখানে যে অবস্থায় সেরূপ শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব, সেখানে বয়স বাড়াইয়া বৃথা দুর্নীতি এবং অধর্ম্ম প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। এ সকল বিষয় বিশেষ সতর্কভাবে বিবেচনা করিয়া অভিভাবকগণ পাত্র পাত্রীর বয়স নির্দ্ধারণ করিবেন। ১৬ বৎসর বা ২০ বৎসর পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে, এরূপ নিয়ম করিলেই যে সমাজ ধর্ম্মনীতিতে ভূষিত হইবে, তাহা নয়। পাশ্চাত্য সমাজ সমূহের ইতিহাসে তাহা দেখা যায় নাই।

এস্থলে সংক্ষেপে আর একটী কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজন। পাত্র পাত্রীর বয়স দেখা, শিক্ষা, চরিত্র ও ধর্ম্ম দেখা যেমন উচিত, উভয়ের প্রকৃতি ও স্বভাবের সামঞ্জস্য, উভয়ের আকার গঠন প্রভৃতি দেখাও সেইরূপ নিতান্ত প্রয়োজন। কেবল তাহা নয়, বর কন্যার পিতামাতার ধাতু প্রকৃতি দেখাও প্রয়োজন। এ সকল দেখা শুনা কার্য্য অভিভাবকগণ ভিন্ন ভালরূপ নির্ব্বাহ হইতে পারে না—কেননা পাত্রপাত্রী রূপজ মোহে অনেক সময়ে আচ্ছন্ন থাকে। দুঃখের বিষয় এ সকল বিষয়ে দৃষ্টি ক্রমেই হ্রাস হইতেছে। এতদ্ভিন্ন বরকন্যার বংশ পরম্পরায় কোন্ ব্যাধি আছে কি না, ইহা দেখাও নিতান্ত আবশ্যক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, আর্য্য-চিকিৎসা শাস্ত্র, মনু, বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রভৃতি একবাক্যে বিকলাঙ্গ প্রাপ্ত বর কন্যার বিবাহ নিষেধ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। সঞ্চারী রোগ, অর্থাৎ অর্শ, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, হিষ্টিরিয়া, উপদংশ, শ্বাস, উন্মাদ, মৃগী, মূত্র-পীড়া থাকিলে তদ্বংশে বর্ত্তে (১)। ডাক্তার আর্থার মিচেল বলেন, বধির, মূক ও

(১) হিন্দুবিবাহ সমালোচন—১৪৩পৃষ্ঠা, and Hygiene Dr. D. Basu. Vol II. P. 155-156.

বিকল মস্তিষ্কের সহিত বিবাহ হইলে ২০ হাজারের মধ্যে একটী ঐরূপ সন্তান হইতে পারে (১)। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে বংশগত রোগাদি বা অঙ্গবৈলক্ষণ্যাদির প্রতি লোকে আর তত দৃষ্টি করে না। ব্রাহ্ম-সমাজে মস্তিষ্কহীন নিরেট বোকা (idiot) ও যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত মেয়ের পর্য্যন্ত বিবাহ হইয়াছে। ইহাদ্বারা বংশপরম্পরাকে পাপের ভাগী করা হয়। এ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।

তারপর কথা হইতেছে, অসম বয়স্ক পাত্র পাত্রীর সহিত বিবাহ দেওয়া উচিত কি না? আমাদের বিবেচনায়, তাহা একেবারেই উচিত নয়। কেবল জড়বিজ্ঞান, ও নীতিবিজ্ঞানের অনুরোধে নয়, অসম বিবাহে সমাজের ও পরিবারের নানাপ্রকার দুর্গতি ঘটে। শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র মহাশয় নানা শাস্ত্র দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, অসম বিবাহ শাস্ত্রসম্মত নয়। ১০ বৎসরের বালিকার সহিত ৩৫ বৎসরের যুবকের বিবাহে যেরূপ দাম্পত্য-প্রেমের ব্যাঘাত ঘটে, ২০ বৎসর বয়স্ক যুবতীর সহিত ৫০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের বিবাহেও তদ্রূপ ব্যাঘাত হয়। * অথচ দেখা যায়, হিন্দু-সমাজে অবাধে এই অসম বিবাহ প্রথা চলিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজেও বিপত্নীক বিবাহে স্থানে স্থানে এই বয়সের ঘোরতর বৈষম্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। কিরূপে ৩০ বৎসর অধিক বয়স্ক স্বামীর সহিত অপরিপক্ক-মন বালিকা স্ত্রীর গভীর প্রণয় জন্মিবে, তাহা আমরা কোনক্রমেই কল্পনা করিতে পারি না। অসম ও বহুবিবাহের কুৎসিত পদ্ধতি প্রচলিত থাকার দরুণই বালিকা যুবতী বিধবার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। † এই অসম বিবাহের দরুণই আমাদের দেশে অনেক বিধবা দুশ্চরিত্রা হয়। সমাজের দুশ্চরিত্রতা নিবারণ করিতে হইলে, এই অসম ও বহুবিবাহ সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জন করিতে হইবে।

অসম বিবাহে সমাজে যে পাপ প্রশ্রয় পাইতেছে, একথা বুঝাইতে আর অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না। বর্ত্তমান সময়ে যে আমাদের দেশে স্বৈরিণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ (১)। তদ্ভিন্ন আর একটী কুফল ফলিতেছে। আমাদের দেশে কন্যার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে (২)।

---

(১) See—The Lancet, 16th March, 1872, P. 383.

* হিন্দুবিবাহ সমালোচন—প্রথম খণ্ড ৮৯ পৃষ্ঠা।

† হিন্দুবিবাহ সমালোচন—২য় ভাগ, ৯৭ পৃষ্ঠা দেখ।

(১) Census Report, 1881. Yol. 1.

(২) Census Report Vo. 1. P. 42.

সাধারণত স্বামীর বয়স স্ত্রী অপেক্ষা ২৫ বৎসর অধিক হইলে পুত্রের সংখ্যা হ্রাস হইতে থাকে, এবং স্ত্রী পূর্ণাবস্থা (২৫ বৎসর) প্রাপ্ত হইলে এবং স্বামী ৭৫ বৎসরের হইলে পুত্র অপেক্ষা কন্যার সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে (৩)। আমাদের দেশে অসম বিবাহের দরুণ সাধারণত কন্যার সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িয়াছে, অন্য দিকে এই অসম বিবাহের দরুণ বিধবার সংখ্যাও খুব বাড়িতেছে। (৪) রিপুর উত্তেজনাকে দমন করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়, সুতরাং দুর্নীতি যথেষ্ট প্রশ্রয় পাইতেছে। অসম বিবাহের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র মহাশয় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন; এজন্য আমরা আর আলোচনা করিলাম না (৫)। এই দুর্নীতি নিবারণ করিতে হইলে অসম বিবাহকে একেবারে তুলিয়া দিতে হইবে। আত্মসংযম জীবনের একটা কর্ত্তব্য, ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মসাধনের প্রধান অঙ্গ। ইহা যদি আমাদের দেশে বৃদ্ধ বিপত্নীকগণ জীবনে প্রতিপালন করিয়া আদর্শ দেখাইতে না পারেন, তবে কখনই আশা করা যাইতে পারে না যে, অপেক্ষাকৃত অল্পজ্ঞানী বিধবারা তাহা পারিবে। এইজন্যও বিপত্নীক বিবাহের স্রোত থামাইতে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। কেবল এজন্যও নয়। প্রকৃত বিবাহ মানুষের একবার ভিন্ন হওয়া উচিত কিনা, ঈশ্বরের সে বিধান কি না, পরকাল-বিশ্বাসীর পক্ষে সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ বিদ্যমান। ১৮৭২ সালের ৩ আইনে স্ত্রী জীবিত থাকিলে পুরুষের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু পরকালে স্ত্রী যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন আর রাজার আইন খাটে না, সুতরাং তখন অবাধে বিবাহ চলে। পরকাল-বিশ্বাসীর পক্ষে এরূপ করা অত্যন্ত অন্যায়। স্ত্রী ইহকালেই থাকুন, পরকালেই থাকুন, একাধিকবার বিবাহ করিলেই বহুবিবাহ হয়। বহুবিবাহের প্রতিরোধ করা একান্ত উচিত। বহুবিবাহের অপকারিতা সম্বন্ধেও আমরা আর বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। কেননা, এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার "বহুবিবাহ" নামক সুন্দর পুস্তক খানি সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমাদের একমাত্র বক্তব্য এই, বহুবিবাহ ও অসম বিবাহের স্রোত প্রতিহত করিবার জন্য সকলের প্রাণপণে যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

---

(৩) Hygiene &Public Health in Bengal By Dr. D. Basu, Vol.II. p. 145.

(৪) Hygiene and Public Health in Bengal. Vol II. P. 159.

(৫) হিন্দুবিবাহ সমালোচন, প্রথম ভাগ ৮৭ পৃষ্ঠা হইতে ১১৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

বিপত্নীকগণ অধিক বয়সের কন্যা পাইতে আশা করিতে পারেন না, তরাং বাধ্য হইয়া অল্পবয়স্ক বালিকাদিগকে বিবাহ করিতে হয়। ব্রাহ্ম-সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইতেছে বটে, কিন্তু বয়স্থা বিধবার পুনর্বিবাহ যে দূষিত, একথা অনেকেই স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং ব্রাহ্ম-সমাজেও ৪০ বৎসরের অধিক বয়স্ক বিপত্নীক যদি পুনঃ পুনঃ বিবাহ করেন, তবে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অন্ততঃ ২৫ বৎসরের ছোট যুবতীকে বিবাহ করিতে হইবে। ইহাতেও অসম বিবাহের নানা কুফল ফলিতে থাকিবে। বৃদ্ধ বিপত্নীক বা বৃদ্ধ বিধবার পক্ষে নানাকারণে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাই শ্রেয়। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, স্ত্রীর চিতার আগুন নির্ব্বাপিত হইতে না হইতে, কি ব্রাহ্মসমাজ, কি হিন্দুসমাজ, সর্ব্বত্রই অধিকাংশ বিপত্নীকগণ পুনর্বিবাহের জন্য পাত্রী অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ হওয়াতে, মানুষকে নিতান্ত রিপু-পরবশ বলিয়া মনে হয়। উপযুক্ত পুত্র কন্যা বর্ত্তমানেও পুত্র কন্যা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক পাত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া এদেশের লোকেরা কত অসারত্বের পরিচয় দিতেছে, দেখ! ব্রহ্মচর্য্য, আত্মসংযম, নিবৃত্তি-সাধন এ সকল আমাদের দেশে এখন কথার কথা হইয়া উঠিয়াছে। এই শোচনীয় অবস্থায় আত্ম-সংযম ব্রত শিক্ষা দিবার জন্য আমাদের দেশের সমাজের পক্ষে খুব চেষ্টা করা উচিত। আত্মসংযম ব্রত-শিক্ষা না দিলে, এবং বিপত্নীক ও বয়স্থা বিধবা-বিবাহের স্রোতের গতিরোধ না করিলে, নানা দুর্নীতি যে প্রশ্রয় পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য, আত্মসংযম ব্রত এদেশের মনুষ্যকে অতি শৈশব হইতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী পর্য্যন্ত এজন্য রূপান্তরিত করা উচিত।

আমরা বলিয়াছি, আদর্শ বিবাহ সমাজে প্রচলিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা বালবিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী। অর্থাৎ উপযুক্ত বয়সে ধর্ম্মজ্ঞান লাভের পর আদর্শ বিবাহ হইলে, এবং বিবাহের পর স্বামী সহবাস হইলে আর বিধবা বা বিপত্নীকের বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। সতীত্বের মর্য্যাদা অপ্রতিহত রাখিবার জন্য এবং পাশ্চাত্য সমাজের কুফল নিবারণের জন্য ইহা করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। তবে স্থান বিশেষে, মানুষের ব্যভিচার নিবারণের জন্য বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সে বিবাহকে পৈশাচিক বিবাহ জ্ঞানে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে হইবে, আদর্শ মনে করিতে হইবে না। না হইলে বিবাহ কার্য্যটা কালে একটা ব্যবসায় ন্যায় হইয়া

উঠিবে। পাশ্চাত্য সমাজে সেইরূপই হইয়াছে। এই রূপ চুক্তি-বিবাহ যে সমাজে চলিয়াছে, সেই সমাজেরই দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সেখানকার লোকেরা বারম্বার বিবাহ করে এবং বারম্বার বিবাহ ভাঙ্গে। বিবাহ করিলে সেখানে অশান্তির আগুন আরো প্রজ্বলিত হয়। মনোনয়নের ভুল ভ্রান্তির জন্য বিবাহ ভঙ্গ প্রথায় সম্মতি দিলে, অসংখ্যবার মানুষকে বিবাহ করিতে অনুমতি দিতে হয়। অসংখ্যবার বিবাহ করিলে বিবাহের আধ্যাত্মিকতা লোপ পায়। বিলাতে সতীত্বের আদর দিন দিন হ্রাস হইতেছে, বিবাহ প্রথা স্বার্থসাধনের উপায় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে (১)। এই সময়ে যাহাতে সতীত্বের আদর বৃদ্ধি পায় এবং বিবাহটা কোনক্রমে একটা চুক্তিতে বা ব্যবসাতে পরিণত না হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন। সৌভাগ্যের বিষয়, এ বিষয়ে অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বিধবা এবং বিপত্নীকগণের মধ্যে যাহাতে ব্রহ্মচর্য্যা-শিক্ষা বিস্তৃত হয়, তৎপক্ষে বিশেষ চেষ্টার এখন আবশ্যক। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অনেক বিপত্নীক মহাত্মা এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়া উচ্চ জীবনের আদর্শ দেখাইতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে স্থানে স্থানে ব্যতিক্রম ঘটিতেছে বলিয়া আমরা দুঃখিত। আমাদের একান্ত অনুরোধ এই, ১৮৭২ সালের আইনানুসারে যে সকল যুবক যুবতীর বিবাহ হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ বিধবা বা বিপত্নীক হইলে আর পুনঃ বিবাহের চেষ্টা করার প্রয়োজন নাই। যদি কেহ বিবাহ করে, তবে সে বিবাহকে আদর্শ মনে করা উচিত নয়। কিম্বা পূর্ব্ব-বিবাহিত যে সকল বিধবা বা বিপত্নীকের সন্তান জন্মিয়াছে, তাহাদেরও পুনর্বিবাহ প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। ভারতের অনেক সভ্য জাতির মধ্যে এরূপ বিবাহ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সে বিবাহ চিরকাল নিন্দিত ও ঘৃণিত। ভূমিষ্টসন্তান লইয়া কোন বিধবা ব্রাহ্মসমাজে বিবাহ করিয়াছেন, আমরা শুনি নাই। কিন্তু উপ-

---

(১) "That the proportion of unhappy marriages is larger in England than in India, still larger in America." "That the proportion of unhappy marriages in England and America is due to the very conception of marriage upon which the present reform agitation based, namely, as an instrument of attaining personal happiness, and not a means of serving family and society, of making others happy beside the couple themselves."

Amrita Lal Ray.

যুক্ত সন্তান বর্ত্তমান থাকিতে বিপত্নীক বিবাহ করিয়াছেন, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ সাম্যবাদানুসারে না চলিয়া বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকারের লিখিত অনুপাতবাদানুসারে চলিতেছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বয়স্থা বিধবা এবং অধিক বয়স্ক বিপত্নীকদিগের জন্য এক রূপ ব্যবস্থা হওয়াই উচিত। কেহ রিপু-দমন করিবে, কেহ রিপু চরিতার্থ করিতে থাকিবে, এ কলঙ্কের প্রথা ব্রাহ্মসমাজের সাম্যবাদের মধ্যে স্থান পাইতেছে বলিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। এইরূপে বাহুল্য বিবাহ-স্রোত বন্ধ হইলে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়ায় দেশের দারিদ্র্যও অনেক নিবারিত হইবে। এসম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ধর্ম্ম যাঁহাদের লক্ষ্য, আত্মসংযম যাঁহাদের মূল তন্ত্র, তাঁহারা কার্য্যকালে আত্মসংযম করিতে পারিবেন না, ধর্ম্মগত জীবন লাভ করিতে পারিবেন না, ইহা বড়ই দুঃখের কথা।

বিবাহ, আধ্যাত্মিকতা সাধনের অবলম্বন। বিবাহ কেবল সংসারের ইষ্টানিষ্ট সাধনের জন্য নয়; ধর্ম্মসাধনের সহায়তার জন্যও কিন্তু সেই বিবাহ ক্রমাগত অসংখ্য বার হইতে দিলে, প্রেমের পরিবর্ত্তে রিপু পরিচর্য্যারই অধিক প্রশ্রয় দেওয়া হয়; এবং ইহাতে অযথা দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়। পরকালে এক পা দিয়া, পক্ককেশ ও গলিতচর্ম্ম, জীর্ণ শীর্ণ দেহধারী যে সকল বিপত্নীক পঞ্চীকরণ ষড়ীকরণ বিবাহের জন্য লালায়িত হন, তাঁহা-দিগের রিপুর উত্তেজনা নাই, "কেবল দুধ গরম করিয়া দিবার জন্য বা সন্তান পালনের জন্য, বা আধ্যাত্মিকতা উপার্জ্জনের জন্য যে বার বার স্ত্রী গ্রহণ করিতেছেন," এ কথা কোনক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না। কেবল ম্যাল্থা-সের মত রক্ষা করিয়া দারিদ্র্য নিবারণের জন্য নয়, আমাদের বিবেচনায়, আধ্যাত্মিকতা সাধনের জন্যও একাধিক বার বিবাহ হইতে পারে না। এমন কি, পুত্র লাভের জন্যও বারম্বার বিবাহ করা উচিত নয়। বহুবিবাহ আমাদের দেশের শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। * স্ত্রী সংসারে থাকিলে বিবাহ দূষিত, আর পরকালে থাকিলে বিবাহ দূষিত নয়, পরকালবিশ্বাসী ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তির পক্ষে এ কথা বলা সঙ্গত নয়। তবে বিপত্নীক বালক বা বিধবা বালিকাদের বিবাহের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের প্রথম বিবাহকে আমরা বিবাহ বলিয়াই স্বীকার

* বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা, এতদ্বিষয়ক বিচার,, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত, চতুর্থ সংস্করণ দেখ

করিনা। বালবিধবার বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় নানা শাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, বালবিধবার বিবাহ শাস্ত্র সম্মত। † বহুবিবাহের অযৌক্তিকতা ও বালবিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে এ স্থানে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না, কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অন্যান্য অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন।

আমরা সপ্তম পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সামাজিক নিয়মের বাধ্যবাধকতা, এ উভয়েরই প্রয়োজন আছে, এবং একের সহিত অপরের মিলনের স্থান আছে। (১) উভয়ের মধ্যে সীমা-রেখা নির্দ্ধারণ করা কিছু কঠিন বলিয়া আমরা অনেক বিজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। তৎপর দেখাইয়াছি, ব্রাহ্মসমাজে এইরূপ সামাজিক নিয়মের আবশ্যকতা, ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য নেতা মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াই নবসংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন; এবং এই নবসংহিতা অনুসারে যাহাতে পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি নির্ব্বাহিত হয়, তজ্জন্য দরবার (Apostolic Durbar) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দরবার ব্রাহ্মসমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের দ্বারা সংগঠিত। সুতরাং ইঁহাদিগের সমবেত-বিবেক-শাসন দ্বারা চালিত হইলে, ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল হইবে, এ আশা করিয়া তিনি বড় ভুল করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার এই কার্য্য কতদূর সুফল-প্রসূ হইবে, ভবিষ্যতের ইতিহাস সে কথার উত্তর দিবে।

এই নবসংহিতায় বিবাহ সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর। আমরা এ পর্য্যন্ত বিবাহ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা অতি সুন্দররূপে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অত্যল্প বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত নয়; হঠাৎ-বিবাহ মঙ্গল-প্রসূ নয়; নির্ব্বাচনের

---

† বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা, এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত, ষষ্ঠ সংস্করণ দেখ।

(১) "The laws which Political Economy discovers, like the facts and relations of physical nature, harmonize with what seems to be the law of mental development—not a necessary and involuntary progress, but a progress in which the human will is an initiatory force." Progress Poverty. P. 398.

সময় রিপুর অধীন ও রূপজমোহের বশবর্ত্তী হওয়া উচিত নয়, ধর্ম্ম ও নীতিকে লক্ষ্য করা একান্ত উচিত; বিবাহে অভিভাবকের সম্মতি ও পাত্র পাত্রীর সম্মতি, উভয়ই গ্রহণ করা উচিত; সম্বন্ধ সুস্থির হওয়ার পর পাত্র পাত্রীর আলাপাদি অভিভাবকদিগের অজ্ঞাতে বা অসাক্ষাতে হওয়া উচিত নয়; একাধিকবার বিবাহ দেওয়া উচিত নয়; বিবাহ-ভঙ্গ-প্রথা কোন স্থলেই বাঞ্ছনীয় নয়; বয়স্থ বিপত্নীক বা বিধবার বারম্বার বিবাহ ভাল নয়; কোন প্রকার নৈতিক বা রক্তমাংস সম্পর্কে আবদ্ধ পাত্র পাত্রীর বিবাহ সঙ্গত নয়; অসবর্ণ ও আন্তর্জাতিক বিবাহ উচিত, ইত্যাদি যে সকল কথার আমরা আলোচনা করিয়াছি, সে সমুদায় অতি বিজ্ঞতার সহিত ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায়, আজ হউক কাল হউক, প্রাচীন ও নব-সংহিতার ন্যায় কোন সংহিতা অনুসারে ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ প্রথাকে নিয়-মিত করিতে হইবেই হইবে। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের ও মহাত্মা কেশবচন্দ্রের সূক্ষ্মদৃষ্টি ভাবী সমাজভিত্তির এক প্রধান অবলম্বন হইবে।

অনেকের এইরূপ ধারণা আছে, সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে একটা নিয়ম প্রণালী আছে। আমরা বারম্বার একথা অস্বীকার করিয়াছি। সমাজের একটা কিছু স্থির সিদ্ধান্ত না থাকায় নানারূপ দোষ-মিশ্রিত গোলযোগ দেখা যাইতেছে। সেই সকল গোলযোগের কথা আমরা বাধ্য হইয়া স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছি। সেই সকল দোষ সংশোধিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাহা করিতে হইলে সমাজে আদর্শ মত প্রতিষ্ঠিত করা চাই। এই আদর্শ মত সম্মিলিত বিবেকশক্তি সংস্থাপিত করিবে। সেই মত অনুসারে সমাজের সকল লোক ধর্ম্মত ও ন্যায়ত চলিতে বাধ্য। কারণ, সমাজের আবশ্যকতা মানিতে হইলে এ বাধ্যবাধকতা মানা চাই। এই সকল কথাই আমাদের বলিবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আমরা যথাসাধ্য তাহা বলি-য়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচার করা আমাদের লক্ষ্য নয়। অনেক ব্যক্তি আমাদিগকে দোষী ব্যক্তি সকলের নাম উল্লেখ করিয়া দেখা-ইতে অনুরোধ করিয়াছেন, এবং ঘটনার স্থান ও নামোল্লেখ করিতে জেদ করিয়াছেন। ব্যক্তিগত দোষ ত্রুটীর সহিত আমাদের কোন সংশ্রব নাই। সকল সমাজের সকল লোকই কিছু স্বর্গের দেবতা হইবে না। কোন সমাজই একে-বারে নিষ্পাপ হয় নাই। সকল সমাজেই দুষ্টপ্রকৃতির লোকের সমাগম আছে। ব্রাহ্মসমাজে যে খারাপ লোক একেবারে থাকিবে না, তাহা নয়।

খারাপ লোক আছে, এবং থাকিবে। পাপ সমাজে আছে, এবং তাহা থাকিবে। খারাপ লোকদিগের অন্যায় কার্য্য-সমাজের দ্বারা প্রশ্রয় পাই-তেছে, ইহাই আমাদিগের প্রধান দুঃখ। পাপকার্য্য পুণ্যকার্য্যের নামে প্রশ্রয় পায়, ইহাই খেদ। খারাপ লোক যাহারা আছে, তাহাদের আচার ব্যবহার, কার্য্য প্রণালী সমাজের দ্বারা নিয়মিত হওয়া একান্ত উচিত। নচেৎ সমাজ রক্ষার আর উপায় নাই। ব্রাহ্মসমাজ এক বিষম অগ্নি পরীক্ষায় পড়িয়াছেন। একদিকে যৌবন-বিবাহ, এবং স্ত্রী-স্বাধীনতা, অপর দিকে জাতিভেদ-নাশ এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার। এই সকল গুরুতর কার্য্য সম্পাদনে, সতর্ক না হইলে, পদে পদে অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। এই অল্প সময়ের মধ্যে যে কিছু দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইয়াছে, ইহার ফলভোগ যে কতকাল পর্য্যন্ত ভুগিতে হইবে, তা বিধাতাই জানেন। কঠোর আত্মসংযমের ব্যবস্থা না হইলে ইহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। একদিকে পবিত্রতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা, অন্যদিকে বৈরাগ্য ও রিপুনিগ্রহ;—একদিকে সুখস্বচ্ছন্দতা বা বিলাসিতা বিসর্জ্জন, অন্যদিকে নিষ্কাম পরোপকার-ব্রত গ্রহণ ভিন্ন সমাজের মঙ্গলের পথ নাই। কাজকর্ম্মহীন জীবনেই রিপুর আধিপত্য অধিক স্ফূর্ত্তি পায়। কার্য্য-শিথিলতার সহিত ব্রাহ্মজীবনে রিপু-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে; পূর্ব্বে এরূপ ছিলনা। যাহাতে প্রত্যেকে উপরোক্ত সকল সৎগুণে ভূষিত হইতে পারে, তজ্জন্য এখনই ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন। আদি বংশের দ্বারা এই গুরুতর কার্য্য সংসাধিত না হইলে, পরবংশ যে আরো অধঃপাতিত হইবে, তৎপক্ষে একটুও সন্দেহ নাই। সুতরাং এখন ব্রাহ্মসাধারণের খুব সতর্ক হওয়া উচিত। মন্দ লোক যাহারা আছে, তাহাদিগকে সংশোধন করিতে সমর্থ হইয়া যাহাতে ব্রাহ্মসমাজ দেশের পরম মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, বিধাতা এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। পাপ যাতে এই নব সমাজে আর প্রশ্রয় না পায়, ভগবান তাহা করুন। বিধাতার কৃপা ভিন্ন আর মানুষের কি সম্বল আছে। সেই কৃপা অযাচিতরূপে বর্ষিত হউক।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিবাহ সম্বন্ধে মোটামুটী আমাদের যে সকল কথা বলিবার ছিল, তাহা সংক্ষেপে একরূপ বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের যে সকল কৃতবিদ্য ব্যক্তি লেখনী ধরিয়াছেন, তাঁহাদের পদ-রেণু স্পর্শ করিবারও আমরা অনুপযুক্ত। তাঁহাদের অপেক্ষা কোন ভাল কথা বলিতে পারিব, এ আশা কখনও করি নাই। তবে তাঁহাদের গ্রন্থে যে সকল কথার খুব বিস্তৃত আলোচনা হয় নাই, তাহা এবং ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ-প্রথা সমালোচনা করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যথাসাধ্য আমরা তাহা করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে দেশের সর্ব্বপ্রকার আন্দোলনের মধ্যে এই বিবাহ বিষয়ক আন্দোলনটীও একটী প্রধান। এ সম্বন্ধে সাধারণের সমক্ষে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত চিন্তা উপস্থিত করিবার জন্য আমাদের এই যৎসামান্য চেষ্টা। আমরা এ চেষ্টায় কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, জানি না। তবে ইহা জানি, এ বিষয়টী লইয়া অনেকের মধ্যে যথেষ্ট আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। যে কারণেই হউক, এ প্রবন্ধটী নব্যভারতে প্রকাশিত হইবার পর হইতে প্রবন্ধটী লইয়া দেশে তুমুল আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। অনেকে আমাদের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন, অনেকে সহৃদয়তা ও স্নেহ-আলিঙ্গনরূপ আদর মমতা দিয়া আমাদিগকে চির-কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এখনও আশানুরূপ সংস্কার কার্য্য নির্ব্বাহ হয় নাই বলিয়া পুস্তকাকারে প্রবন্ধগুলি প্রকাশের প্রয়োজন বুঝিলাম; এবং অনেক বন্ধু ইহা পুস্তকাকারে ছাপাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, প্রধানতঃ এই কারণেই, ইহা এই আকারে প্রকাশিত হইল। যাঁহারা বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আরো বিরক্ত হইবেন, জানি। যাঁহারা সদয় আছেন, তাঁহারা আরো সন্তুষ্ট হইবেন, তাহাও জানি। আমরা এ উভয়-নিরপেক্ষ হইয়া, কেবল কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে, এই অবস্থায়, আমরা বর্ত্তমান সময়ে এই পুস্তকের উপসংহার করিলাম। যাহা বলিবার ছিল, ভাল করিয়া বলিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। আমাদের অপেক্ষা কোন উপযুক্ত

ব্যক্তি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে ভাল হইত। কিন্তু কোন কৃতী লোক অগ্রসর হইতেছেন না দেখিয়া কর্ত্তব্যের তাড়নায় আমরা নিরস্ত থাকিতে পারি নাই। পাঠকগণের নিকট বিনীত অনুরোধ, আমাদিগের দোষ ক্রুটী ক্ষমা করেন।

এই পুস্তকে যে সমস্ত কথার আলোচনা করিয়াছি, সে সকলের পুনরুল্লেখ করার কোন প্রয়োজন দেখি না; কারণ, যাঁহারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন, তাঁহারাই আমাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন। কি আছে, এবং আমরা কি চাই, ইহা স্পষ্টরূপে আমরা যথাসাধ্য বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যদি সেগুলি বুঝিতে ভুল হইয়া থাকে, তবে এখন পুনরায় বলিলেও বুঝিতে ভুল হইতে পারে। সুতরাং বৃথা বারম্বার এক বিষয়ের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

কেহ কেহ বলেন, এই প্রবন্ধের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করা হইয়াছে। আমরা খুব ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু এ কথার মূল কি, বুঝিতে পারি নাই। ধর্ম্মের নিকট যে সমাজ খাঁটী, সে সমাজের কে অনিষ্ট করিতে পারে? আর যে সমাজ তাহা নয়, তাহাকেই বা কে পতনের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে? ধর্ম্ম ও নীতির মিলন স্থান—সমাজের এই বিবাহ-প্রণালী। যে সমাজে এই বিবাহ-প্রণালী আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ, সে সমাজের পতন নাই। ব্রাহ্মসমাজ এই বিবাহ-প্রণালীকে ধর্ম্ম ও নীতির উজ্জ্বল ভূষণে যদি একাল যাবৎ সজ্জিত করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে এ সমাজের নিশ্চয় পতন হইয়াছে, আমরা না বলিলেও পতন হইয়াছে। আর যদি ধর্ম্ম ও নীতিকে অপ্রতিহত প্রভাবে বজায় রাখিতে পারিয়া থাকেন, আমরা ত দূরের কথা, শতকণ্ঠে শতজন ব্রাহ্মসমাজের দোষ ঘোষণা করিলেও ইহার পতন নাই। সুতরাং আমাদের দ্বারা ইহার অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই এবং তাহা হয়ও নাই। দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়া ব্রাহ্মসমাজ আপনি যে পতনের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, আমরা তাহার কেবল পুনরুক্তি করিয়াছি মাত্র। সমাজ অধিক দোষী, কি আমরা দোষী? এ কথার বিচার ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা করিবে। আর যাঁহারা ধর্ম্মভীত ব্যক্তি, তাঁহারা করিবেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দোষ আছে বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ গুণশূন্য নয়। গুণশূন্য হইলে ব্রাহ্মসমাজ এতদিন বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু সে কথা

ব্রাহ্মসমাজের লোকের পক্ষে অধিক না বল্লাই ভাল। আত্ম-প্রশংসা সর্ব্ব-নাশের মূল।

আমরা যথাসাধ্য প্রতিপন্ন করিয়াছি, যৌবন-বিবাহই জীবনের এক-মাত্র মঙ্গলের পথ। তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে খুব সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, এই কথাগুলির বিশেষ আন্দোলন করাই আমাদের অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল। যে কারণেই হউক,—এদেশে যৌবন-বিবাহের সূত্রপাত হইয়াছে,—ইহার গতি আর ফিরিবে না,—ফিরি-বার নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের পতিত সমাজের উপর দিয়া এক প্রবল পরিবর্ত্তনের স্রোত চলিয়াছে, ইহার স্রোত থামাইতে পারেন, এমন ব্যক্তি দেখি না। এই স্রোত আমাদের হিন্দুসমাজকে তোলপাড় করিয়া ফেলিতেছে। অনেক বিষয়ে ভালও করিতেছে, অনেক বিষয়ে মন্দও করিতেছে। আমরা দেখিতেছি, বিবাহ বিষয়েও অল-ক্ষিত ভাবে হিন্দুসমাজে একটা বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে বালিকা ঋতুমতী হওয়ার পূর্ব্বে বিবাহ হইত, এখন অনেক স্থলে তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে। কোন মহারথীর আর এ স্রোত ফিরাইবার শক্তি নাই। আমাদের বিবেচনায়, পরিবর্ত্তনের এই কার্য্যটী ভাল হইতেছে। কিন্তু ভয় হয়, পাছে পাশ্চাত্য সমাজের নানা দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। আমাদের দেশে সতীত্বের যেরূপ সম্মান, অন্য কোন দেশে এরূপ সম্মান নাই। এই জন্য উভয় দেশের আইনেই বা কত পার্থক্য দেখা যায়। আমাদের দেশে পত্যন্তর-গ্রহণ কত ঘৃণিত, পাশ্চাত্যসমাজে কতবার পত্যন্তর-গ্রহণ হইতেছে, অথচ কোনই সম্মানের হানি নাই! আমাদের দেশে পতিতা রমণীর সমাজে স্থান নাই, পাশ্চাত্য সমাজে সেরূপ নয়। ভয় হয়, পাছে যৌবন-বিবাহ-প্রাবল্যের সহিত আমাদের দেশে স্বেচ্ছাচারিতা, লজ্জাহীনতা বা সতীত্ব-বোধ-হীনতা প্রচারিত হয়, পাছে বিবাহ-ভঙ্গ-প্রথা স্থান পায়, পাছে দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। এই জন্য আমরা এই গুরুতর বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছি। ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান সময়ে এই সকল গুরুতর সংস্কারকার্য্যে অগ্রণী বলিয়া, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই অধিকাংশ কথা বলিয়াছি। সংস্কারের পথে যে অগ্রসর হয়, তাহাকে অনেক সহিতে হয়, ইহা আমাদের ধারণা। পরীক্ষার তীব্র কষাঘাত সহ্য করিতে না পারিলে উন্নতি অসম্ভব। ব্রাহ্মসমাজকে

এই জন্য অনেক লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছে, আরও হইবে। আমরাও কতক সেই লাঞ্ছনা দিলাম। এই জন্য অনেক সহৃদয় ব্যক্তি হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছেন, জানি। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে, দেশ এবং সমাজের মঙ্গলের মমতায়, কঠোর হইতে কঠোর হইয়া আমাদিগকে এই কার্য্য পালন করিতে হইয়াছে। ফল এই পাইয়াছি, ব্রাহ্মসাধারণ আমাদিগকে কত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছেন! এত ঘৃণা ও অপমান মস্তকে করিয়াও এই কর্ত্তব্য পালন করিলাম। ব্রাহ্মসমাজ এক দিন আমাদের এ ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, আশা করি। আর সমগ্র দেশ, যাহার মঙ্গলের সহিত আমাদের রক্ত মাংসের জড়িত-যোগ, আশা করি, এই বিষম পরিবর্ত্তনের সময়ে ধীরতা এবং ধৈর্য্য সহকারে, নীতি ও ধর্ম্ম যাহাতে অপ্রতিহত ভাবে বজায় থাকে, তৎপক্ষে চেষ্টা করিবেন। আমাদের স্থির বিশ্বাস, ধর্ম্ম ও নীতি লক্ষ্য পথে না থাকিলে, এবং তাহা ব্যবহারিক জীবনে প্রতিপালিত না হইলে, দেশের কোন প্রকার মঙ্গল নাই। ধর্ম্ম, মানবের সঞ্জীবনী শক্তি। ধর্ম্মই মানবের একমাত্র চরিত্রের ভিত্তি। যে সমাজে ধর্ম্ম নাই, সে সমাজে কিছুই নাই। হিন্দুসমাজে অপ্রতিহত প্রভাবে যাহাতে ধর্ম্ম ও নীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, সকলে প্রাণপণে সেই চেষ্টা করুন। এক মাত্র ধর্ম্মহীনতাই, বর্ত্তমান সময়ের দারিদ্র্যই বল দৌর্ব্বল্যই বল, যাহা বল, সকলের মূল। অতএব ধর্ম্ম আবার যাহাতে দেশে জাগে, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করা উচিত। ধর্ম্মশূন্য যৌবন-বিবাহ সর্ব্বনাশের মূল। পাশ্চাত্য সমাজ সমূহ ইহার শোচনীয় ফলভোগে উৎসন্ন যাইতেছে, সাবধান, সাবধান,—নব হিন্দুসমাজ এই পরিবর্ত্তনের স্রোতে পড়িয়া যেন সেই ধর্ম্মশূন্য-যৌবন-বিবাহে বা সর্ব্বনাশের আকর্ষণে, জীবন প্রাণ, ধন মান অপেক্ষা অধিক পূজ্য, ও অধিক পবিত্র চরিত্র ও ধর্ম্ম ধনে বঞ্চিত না হয়! ভারত যেন মহা অমূল্য সতীত্ব রত্নে বঞ্চিত না হয়! ভারত-রমণীর এই চিরপূজ্য, চিরোজ্জ্বল সতীত্ব রত্নের নিকট কোটী কোটী কহিনুর তুচ্ছ কথা। সাবধান, ভারত যেন এই রত্নহীন না হয়।

সমাপ্ত।